অতঃপর

বিমল কর

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ : ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :
সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ প্রাইমা প্রেস
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
সুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯।২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীফণিভূষণ আচার্য
কল্যাণীয়েষু

ATAHPAR
BY BIMAL KAR

গাড়িটা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে গেল। কেশব ভেবেছিল দাঁড়াবে না, আর পাঁচটা গাড়ির মতন সোজা চলে যাবে; বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করবে না কেশবদের।

গাড়িটা যেন আচমকাই দাঁড়াল।

কেশব তখনও ভাল করে হাত নামাতে পারে নি।

'দাঁড়িয়েছে রে', কেশব বলল, বলে গাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

সুশীতল দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির পিছনের লাল আলো-টালো দেখছিল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। সামনের দিকে অবশ্য রাস্তাটা চোখে পড়ছে, গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো রয়েছে বলে যতটা চোখে পড়ে। চারদিকে বিস্তর গাছপালা, পুকুর-টুকুরও আছে বোধ হয়। শীতের সময় নয়, তবু এই ফাঁকায় ঠাণ্ডাই লাগছিল। দুপুরেও এক পশলা ঝমঝমে বৃষ্টি হয়েছে এদিকে, বংশী বলছিল।

কেশব সুশীতলকে ডাকছিল।

সুশীতল এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। যাক্, কেশব শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছে। এখন মনে হচ্ছে কলকাতায় ফেরা যাবে। অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে সুশীতল বিপন্ন বোধ করছিল, কলকাতায় ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল এবং ভাবছিল আবার না বংশীর বাড়িতে ফিরে যেতে হয়।

সুশীতল গাড়ির কাছে আসতেই কেশব ডাকল, 'তাড়াতাড়ি আয়।'

পিছনের দরজা লক্ করা ছিল। ভদ্রলোক সিটের পিছনের দিকে হেলে পড়ে লক্ খুলছিলেন। সুশীতল গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল কেশবের পাশে।

কেশব বলল, 'ওঠ'।

সুশীতলকে তুলে দিয়ে কেশব উঠল। দরজা বন্ধ করল।

সামনের ভদ্রলোককে সামান্য বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল। মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সুশীতল। পাশে এক মহিলা। মহিলা সামান্য যেন বাঁকা হয়ে বসে তখনও সুশীতলদের দেখছিল। হালকা রঙের শাড়ি, মাথায় খোঁপা, মোটামুটি সুশ্রী বলেই মনে হল সুশীতলের।

গাড়ি ছাড়তেই কেশব বলল, 'এই আমার বন্ধু। এরই জন্যে মেয়ে দেখতে এসেছিলাম। এসে কী প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম দেখলেন তো! এই সব মফস্বলের বাস-টাসের ওপর মানুষ ভরসা করে! ধ্যুত্।...আপনারা দয়া না করলে আজ আমাদের কি অবস্থা হত কে জানে!'

কেশব যে সামনের ভদ্রলোককেই উদ্দেশ করে কথাগুলো বলছিল স্পষ্টই বোঝা যায়। সুশীতল বেশ অবাক হল। দেখল বন্ধুকে। কেশব তাকে দেখছে না, গ্রাহ্যও করছে না। কথা বলছে। কেশব একটু বেশী কথা বলে। সুশীতল অনুমান করল, ভদ্রলোককে বাগাবার জন্যে ইতিমধ্যেই কেশব অনেক কিছু বলেছে; আর এখন যতক্ষণ গাড়িতে আছে বকবক করবে। অবশ্য এই অবস্থায় ভদ্রলোককে কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে আলাপ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'আধঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি' কেশব বলল, 'একটা বাস নেই, ট্যাক্সির কথা বাদ দিন, প্রাইভেট গাড়ি পাঁচ সাতটা চলে গেল। হাত দেখালাম। কেউ দাঁড়াল না। আপনারা দয়া করে দাঁড়ালেন—'

ভদ্রলোক কেশবের কথার মাঝখানে বললেন, 'জায়গাটা ভাল নয়। রাস্তা থেকে অচেনা লোক তোলা রিস্কি। কে যে বিপদে পড়েছে আর কে গুণ্ডা বদমাশ বোঝা মুশকিল।'

কেশব এবার একটু রসিকতা করল, প্রথমে হাত জোড় করল,

তারপর হেসে বলল, 'আমরা কিন্তু দাদা গুণ্ডা বদমাশ নই ; একেবারে ছাপোষা নিরীহ ভদ্রসন্তান। আমি সরকারী চাকরি করি, রাইটার্সে ; শ্যামবাজারে থাকি। আর আমার এই বন্ধু সুশীতল, সুশীতল মুখার্জি রয়েছে বার্ণ-য়ে। ও থাকে দর্জিপাড়ার দিকে।' বলে কেশব সুশীতলের দিকে তাকাল, নিচু গলায় বলল, 'সিগারেটের প্যাকেটটা বের কর।'

সুশীতল সিগারেটের প্যাকেট দিল। কেশব প্রথম সিগারেটটা বার করে সামনের দিকে ঝুঁকল। 'একটা সিগারেট নিন।' ভদ্রলোককে আপ্যায়ন করবার চেষ্টা করল কেশব।

'আপনারা খান...।'

'আপনি নিন একটা।'

ভদ্রলোক যেন অনুরোধ রাখতেই সিগারেট নিলেন।

কেশব সুশীতলকে সিগারেট দিয়ে নিজে নিল। 'দেশলাই দে।'

গাড়িটা সামান্য ধীরে চলতে লাগল। লাইটার ছিল ভদ্রলোকের, সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। কেশবরাও সিগারেট ধরাল।

গাড়ি আবার জোর হল। সুশীতল পিছন থেকে ভদ্রলোক, ভদ্র-মহিলাকে দেখছিল। দুজনেই সামনের দিকে তাকিয়ে। ভদ্রলোকের মাথার চুল দেখে সুশীতলের মনে হল, হয়তো একটু শৌখিন মানুষ, বড় বড় চুল ঘাড় পর্যন্ত, বয়েস নিশ্চয় খুব একটা হয়নি, গলার স্বরও তেমন মোটা ভাঙা নয়। মহিলার মাথা এবং পিঠ দেখা যাচ্ছিল। শাড়ির আঁচলে পিঠ ঢাকা। সামান্য লম্বা ঘাড় চোখে পড়ছে। খোপাটা এলো ধরনের। পাশাপাশি বসে থাকলেও একজন পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর না-ও হতে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী হলে সেটা কেমন করে যেন বোঝাও যায়। সুশীতল বুঝতে পারল, এরা স্বামী-স্ত্রী ; দুজনের বয়সেরও খুব কিছু তফাত নেই ; মহিলা চল্লিশ-টল্লিশ হতে পারে, ভদ্রলোক পঞ্চাশের নীচে।

গাড়ি চলছিল। সামনের দিকে খানিকটা ঝাপসা ভাব রয়েছে, হেডলাইটের আলোয় রাস্তা দেখার অসুবিধে অবশ্য হচ্ছিল না, কোথাও কোথাও এবড়ো খেবড়ো গর্ত রয়েছে।

কেশব কথা বলল, 'আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন ?'

আলাপের চেষ্টা করছে কেশব, সুশীতল বুঝতে পারল। ভদ্রলোক যা উপকার করলেন তাতে সৌজন্য দেখাতেও এটা প্রয়োজন ; চুপচাপ থাকা যায় না।

'বারাসত।'

'ও !' কেশব এমন একটা শব্দ করল যেন বারাসত ওর ঘরবাড়ি। 'বেড়াতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমাদের পরিচিত একজন থাকেন।'

কেশব সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিয়ে কাশল বার দুই। 'আপনি কোন্ দিকে থাকেন ? সাউথ ?'

'না, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায়।'

'কোথায় ?'

'বিবেকানন্দ রোড।'

'তবে তো আমাদের খুব কাছাকাছি। সুশীতলের বাড়ির কাছেই।'

ভদ্রলোক চুপচাপ।

কেশব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার নাম ?'

কেশব এমন করে 'স্যার' বলল, যেন সহজ সরল রঙ্গই করল সামান্য।

'মিহির গাঙ্গুলি। ইনি আমার স্ত্রী।' বলে পাশের দিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

সুশীতল কোন কথাই বলছিল না। চুপচাপ। গাড়ির আরাম যেন তাকে অলস করে তুলছিল। ছোট গাড়ি, হাত পা ছড়াবার প্রচুর জায়গা নেই। তবু সবদিক থেকেই মোটামুটি আরামদায়ক। গদি নরম। ভেতরে কোন আলোও জ্বলছে না। ড্যাশ বোর্ডের আলোও চোখে পড়ছিল না সুশীতলের।

কেশবের পক্ষে চুপ করে থাকা মুশকিল। সামান্য পরে আবার

সে কথা বলতে শুরু করল। যশোর রোড, আজকের আবহাওয়া, কলকাতার বর্ষা, সি. এম. ডি. এ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা থেকে প্রায় লাফাতে লাফাতে রাজনীতি, বেকারী ইত্যাদি প্রসঙ্গে চলে গেল। কেশবের চরিত্রই হল এই। ওর সামনে বোবা মানুষও বোধ হয় মুখ বুজে বসে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ।

মিহিরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কেশব তার স্ত্রীর সঙ্গেও কথাবার্তা বলছিল। মহিলাকে বারকয়েক 'দিদি দিদি' বলে সামান্য অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল কেশব। সুশীতলের কেমন যেন একটু হাসি পেল। কেশব এই ভাবেই চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়েল ছেলে বাবা!

সুশীতলের হঠাৎ খেয়াল হল তারা দমদমের কাছাকাছি এসে পড়েছে। জায়গাটা তার চেনা। মাঝে মাঝে আসতে হয়েছে। পবিত্র থাকত এই দিকেই। পবিত্রর বোন রেখা এখানের কোন্ স্কুলে চাকরি করত। একদিন স্কুলে যাবার সময় বাসের ধাক্কা খেয়ে হাত-পা ভাঙে। খোঁড়া মতন হয়ে গিয়েছিল। সেই পবিত্র বা রেখার আর কোন খবর নেওয়া হয় নি। কে জানে তারা এখনও এদিকে আছে না চলে গেছে।

কেশব ঠেলা মারল সুশীতলকে। সুশীতল বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

'তোর কী হয়েছে?'

'কেন?'

'কথাই বলছিস না?'

'কী বলব! তুই তো একাই বলছিস।'

'দিদি কী বলছেন, শুনলি?'

'কী?'

'তোর মেয়ে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন?' কেশব হাসল।

সুশীতল মহিলার দিকে তাকাল। ঘাড় পিঠ সামান্য ঘুরিয়ে বসে আছেন মহিলা। বোধ হয় কেশবের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলেই ওই

ভাবে বসে আছেন। সুশীতল স্পষ্ট করে মুখ দেখতে পেল না, গালের একটা পাশ একেবারে আড়ালে। নাক যেন সামান্য খাড়া, টিকোলো নয়, গালের কাছটায় গোল নয়, চাপা। মহিলার চোখ সহাস্য কিনা সুশীতল বুঝতে পারল না।

'তুই আমায় বোকা পেয়েছিস?' সুশীতল বলল, একটু নীচু গলায়। অবশ্য ততটা নীচু করে নয় যাতে মহিলার কানে না যায়।

কেশব হাল্‌কা করে বলল, 'পাওয়া পাওয়ির কি আছে! তোর মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি হয় নি এটা তো সহজ প্রশ্ন।' বলে মহিলার দিকে সামান্য ঝুঁকে সামনের দিকে মুখ করে বলল, 'আমার কথা যদি বলেন দিদি, মেয়েটি ভীষণ টেরা, তাকাচ্ছিল আমার দিকে কিন্তু দেখছিল সুশীতলকে। টেরা মেয়ে বিপজ্জনক।' কেশব নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

মহিলা ঠাট্টার গলায় বললেন, 'টেরা মেয়ে পয়মন্ত হয়।'

সুশীতল মহিলার ঠাট্টা শুনল।

গাড়ি একটা মোড় মতন জায়গায় পৌঁছে গেল। এত রাতে রাস্তা ফাঁকাই এক রকম। দু-চারজনকে পথে দেখা যাচ্ছে। পানের দোকানও বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। রাস্তায় ফাঁকা একটা বাস আলো নিবিয়ে দাঁড়িয়ে। নালার গন্ধ আসছিল।

মিহির তার স্ত্রীকে হঠাৎ বলল, 'তোমার সেই কোন্ বোনপো না এখানে কারখানা করেছে, প্রীতি?'

'এখানে? কী নাম এ-জায়গাটার?'

'নাগেরবাজার।'

'এখানেই হবে তাহলে,' মিহিরের স্ত্রী প্রীতি বললেন, 'কি একটা বাজার-টাজার বলেছিল।'

কেশব চট্ করে জিজ্ঞেস করল 'কিসের কারখানা?'

'লোহা লক্কড়ের। গ্রিল, গেট, শাটার তৈরি করবে শুনেছিলাম।'

কেশব প্রীতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মিহিরের সঙ্গেও। সুশীতল চুপচাপ বসে থাকল পিঠ এলিয়ে।

শ্যামবাজারে পৌঁছে কেশব বলল, 'আমি এখানে নামব।'

মিহির গাড়ি দাঁড় করাল। কেশব এতক্ষণে যেভাবে আলাপ জমিয়ে ফেলেছিল তাতে মনে হতে পারে, মিহিররা তার বেশ পরিচিত। নামার সময় আবার কৃতজ্ঞতা জানাল কেশব। 'একদিন যাব আপনাদের ওখানে।'

'আসুন না,' মিহির বলল, 'সন্ধ্যের পর বাড়িতেই থাকি। তাস-টাস চলে? চলে আসবেন।'

আগেই ঠিকানা জেনে নিয়েছিল কেশব, বলল, 'আসব।'

কেশবের সঙ্গে সঙ্গে সুশীলও নেমে যাচ্ছিল।

প্রীতি বলল, 'আপনিও এখানে নামবেন?'

'নামি। কাজ আছে একটু।'

'সে কি মশাই!' মিহির বলল, 'এখানে নেমে শেষে গাড়ি ঘোড়া পাবেন? ট্রাম বাস চলছে এখনও?'

'পেয়ে যাব।'

'আমাদের সঙ্গে আসতে পারতেন, বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যেতেন।'

'তুই চলে যা না,' কেশব বলল।

সুশীতল নেমে পড়ল। মিহির আর অপেক্ষা করল না। স্টার্ট দিল গাড়িতে।

প্রীতি কেশবের দিকে তাকাল। 'আসবেন একদিন।'

'আসব।'

'বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

মাথা নাড়ল কেশব।

গাড়িটা চলে গেল। গাড়ির দিকে দু'মুহূর্ত তাকিয়ে সুশীতল মুখ ফিরিয়ে নিল। বন্ধুর দিকে তাকাল। 'এটা তুই কি করলি?'

কেশব হাসছিল। জোরে জোরে।

সুশীতল সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর লজ্জা সরম বলে কিছু নেই। কাণ্ডজ্ঞান কোন কালেই ছিল না।'

কেশব যেন প্রচণ্ড কোন মজা করছে, হাসতে হাসতেই বলল, 'শালা, এখন আমায় কাণ্ডজ্ঞান শেখাচ্ছিস! তখন কি হয়েছিল, যখন বেমক্কা রাস্তায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিলি?'

'তা বলে তুই ডাঁহা মিথ্যে চালিয়ে গেলি?'

'সো হোয়াট! মুখে এলো বলে ফেললাম। আমরা না হয় তোর বিয়ের মেয়ে দেখতে যাই নি, কিন্তু আমার তো সত্যি সত্যি যশোদার মেয়ে দেখতে যাবার কথা ছিল।'

'আমি যশোদা নই।'

'গুলি মারো যশোদাকে। বিপদে পড়লে দু-চারটে মিথ্যে কথা সকলেই বলে।' কেশব হাত বাড়াল। 'নে, সিগারেট ছাড়। এতটা রাস্তা তোকে বিনি পয়সায় গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে এলাম, মনে রাখবি।'

সুশীতল সিগারেটের প্যাকেট বার করে দিল।

কেশব সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দেখ সুশীতল! বাঙালী মেয়েরা এখনও বিয়ে, বরযাত্রী, বউভাত, মেয়েদেখা এ-সব পছন্দ করে। তুই জানবি, আমি, যদি মেয়ে-দেখার ধাপ্পা না দিতাম, ওরা আমাদের গাড়িতে তুলত না। ইন্ ফ্যাক্ট, মেয়ে দেখতে এসে জলে পড়েছি শুনে মহিলাই আমাদের কৃপা করলেন। হয়তো দেখতে চাইলেন— পাত্রটি কেমন! তোর কপালেই হল, নয়তো শালা গাড়ি বেরিয়ে যেত।' কেশব জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

সুশীতল আর কিছু বলল না। কেশবকে কিছু বলা বৃথা।

দু-চার পা এগিয়ে কেশব বলল, 'তুই চলে গেলেই পারতিস্! বৃথা নামলি।'

'না, এভাবে যাওয়া আমার পোষাত না।'

'তাহলে যা, রিক্‌শা ধর। আমি চলি।'

'লাস্ট ট্রাম পাব।'

'আমায় আর ভোগাস না! প্লিজ! রিক্‌শা নে, চলে যা।'

'ট্রাম আসছে।' কেশব দূরে বেলগাছিয়ার দিকে হাত দেখাল।

ট্রাম আসছিল। কেশব দাঁড়িয়ে থাকল, বন্ধুকে ট্রামে তুলে

দিয়ে যাবে।

সুশীতল বলল, 'কাল তোর সঙ্গে দেখা হবে ?'

'কাল ? কেন ?'

'দরকার ছিল।'

'কাল বাদ দে। পরশু দেখা করব।...কাল আমার অন্য একটা ঝামেলা রয়েছে। বউ গড়বড় শুরু করেছে। একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'কিসের গড়বড় ?'

'তুই বুঝবি না,' কেশব হাসল, 'তুই ব্যাচেলার। স্ত্রীলোকের—মানে স্বামীস্ত্রীর ব্যাপার তুই কী বুঝিস ?...নে, ট্রাম এসে গেছে।'

'তুই আজকাল খুব বুঝনেবালা হয়ে গিয়েছিস ! আচ্ছা !'

ট্রাম কাছে এসে গিয়েছিল। সুশীতল আর দাঁড়াল না। ট্রামের দিকে চলে গেল।

কেশব নিজের মনেই হাসছিল।

দুই

বাড়ি এসে সুশীতল দেখল, কমলার ঘরের দরজা খোলা, বাতি জ্বলছে ; পিসীমার কোন সাড়াশব্দ নেই। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার কথা নয় পিসীমার, রাত্রের দিকে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পায় না, একটা চোখের ছানি কাটিয়ে প্রায় অন্ধ, অন্যটায় ছানি পড়লেও আর কাটাতে রাজী নয়। পিসীমার কপাল খারাপ, খুবই খারাপ। সুশীতল বড়-সড় ডাক্তার দিয়েই চোখের ছানি কাটিয়ে দিয়েছিল পিসীমার কিন্তু কি করে যেন গোলমাল হয়ে গেল।

সুশীতল নিজের ঘরের ভেজানো দরজা খোলার সময় আবার এক-বার কমলার ঘরের দিকের তাকাল। কমলা বিছানায় শুয়ে আছে, না বসে আছে, বই-টই পড়ছে, নাকি বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারল না। সুশীতলের এতটা রাত করে বাড়ি ফেরায় যে কমলা বিরক্ত হয়, মাথা গরম করে, অসন্তুষ্ট হয়, সেটা সুশীতলের অজানা নয়। আজও হয়েছে। আজকাল, সুশীতল বেশ বুঝতে পারে, কমলা দিন দিন যেন রুক্ষ, গম্ভীর, রাগী হয়ে উঠছে। কমলার সঙ্গে মানিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হয় সুশীতলের ; অনেক সময় সে ধরতেই পারে না, কখন কোন্ কথায় কিংবা ব্যবহারে কমলা দপ করে জ্বলে ওঠে। এ আর এক অশান্তি সুশীতলের। দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে।

নিজের ঘরে ঢুকে সুশীতল বাতি জ্বালল। অপেক্ষা করল না। রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। প্যাণ্ট, জামা ছেড়ে একটা ধুতি লুঙ্গির মতন করে পরল। পরে মুখ হাত ধুতে বেরিয়ে গেল।

সুশীতল আবার যখন ফিরে আসছিল তখন বুঝতে পারল, কমলা তার শোবার ঘরে নেই। শোবার ঘর অন্ধকার। রান্নাঘরের

গা-লাগানো ফালি বারান্দায় বাতি জ্বলছে। মানে কমলা সুশীতলের খাবার-দাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ঘরে এসে সুশীতল মুখটা আবার মুছল। চুলও আঁচড়াল না। কেমন যেন একটু সন্ত্রস্ত ভাবে বেরিয়ে এল।

কমলা দাঁড়িয়ে ছিল। সুশীতল এসে বসল, ব্যস্ত ভাবে, যেন এতটা দেরী হয়ে যাওয়ায় সে নিজেই বিরক্ত। কাজকর্মের দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা তার মুখে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও করল। বসতে বসতেই বলল, 'তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

কমলা চুপচাপ; সুশীতলের দিকে যেন ভাল করে তাকাচ্ছিল না।

সুশীতল কৈফিয়তের মতন করে বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল। সোয়া এগারো হবে। এক জায়গায় এমন ফেঁসে গিয়েছিলাম। কই, তুমি খাবে না? খেয়ে নিয়েছ?'

কমলা এবারও কোন জবাব দিল না।

সুশীতল মনে মনে বিরক্ত হল। কমলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কমলা যেন আজকাল তাকে গ্রাহ্যই করে না। সামান্য একটা জবাব দিতে কোথায় আটকাচ্ছে কমলার? সে বোবা নয়। অসন্তুষ্ট হয়েই যেন আর কোন কথা বলল না সুশীতল, শক্ত রুটি ছিঁড়ে ঠাণ্ডা ডালের মধ্যে ডোবাল।

খাবার জায়গাটা ছোট। এক ফালি প্রায় চৌকো ঢাকা বারান্দা। শিয়ালদার বাজার থেকে কেনা সস্তা একটা টেবিল, রীতিমত ছোট, মুখোমুখি দুজনে বসা যায়, টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের শিট্ পাতা; মোছামুছিতে চিটচিটে হয়ে রয়েছে। সাদামাটা সস্তা কাঠের চেয়ার। দুটো চেয়ারের একটা বেশ নড়বড়ে। টেবিল-চেয়ার ছাড়া বাকি জায়গাটুকুতে নানা রকম সাংসারিক সামগ্রী। ভাঁড়ার ঘরের কাজ চালানো হচ্ছে এখানে, এই জায়গাটুকুতে। উপায় কি! দোতলার এই তিন—না তিন নয়, আড়াইখানা ঘরে সুশীতল আর তার পিসীমার সংসার। আগে বেশ কুলিয়ে যেত। কোন অসুবিধে হয় নি। রান্না-ঘরেই খাওয়া দাওয়া হত, পিসীমা টেবিল-চেয়ার বুঝত না। ছোট

ঘরটা ছিল ভাঁড়ার-টাঁড়ারের। কমলা আসার পর জায়গার টানাটানি হয়েছে। পিসীমা নিজের ঘর কমলাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে ঘুপচি মতন ঘরটায় তক্তপোশ পেতে নিয়েছে। বলেছে, আমার আর কি রে, বুড়ো মানুষ, শোবার একটু জায়গা পেলেই হল। জানলা রয়েছে একটা, ওতেই আমার হবে।

কমলা এ-বাড়িতে এসে প্রথমে পিসীমার ঘর দখল করল। তারপর দেখতে দেখতে একে একে সাংসারিক কর্তৃত্বও। এখন সবই কমলার হাতে। রান্না-বান্না, বাজার-হাট, ঠিকে ঝির সঙ্গে চেল্লা-চিল্লি, উনুন কয়লা সবই কমলার কব্জায়। একদিক থেকে এটা ভাল। কেননা পিসীমার চোখে ছানি পড়তে শুরু করার পর বেচারী পিসীমা ধোঁয়ায় তাতে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। যখন তখন জিনিসপত্র উল্টে দিত, ঠাওর করতে পারত না, হাতে পায়ে গরম ফুটন্ত জল, তরি-তরকারি ঢেলে ফেলেছে। কোন দিন পুড়ে-টুড়ে মরত। তাছাড়া পিসীমার বয়েস হয়ে গিয়েছিল, নানা উপসর্গ ছিল দেহের, সংসার আর সামলাতে পারছিল না। কমলা এসে পিসীমাকে বাঁচাল। কিন্তু সুশীতল যেন এই সংসারে তার পিসীমাকেই চাইছিল। মা মারা যাবার আগে থেকেই সুশীতল পিসীমার আঁচলের তলায় মানুষ। মা মারা যাবার পর পিসীমাই তার একচ্ছত্র অভিভাবক। পিসীমা ছাড়া অন্য কাউকে সে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে দিতে রাজী ছিল না। কিন্তু পিসীমা নিজেই কমলাকে একে একে সব ছেড়ে দিল। কেন দিল?

মুখ বুজে এ ভাবে খেতে পারছিল না সুশীতল, কমলা ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কথা বলছেও না, বসছেও না।

সুশীতল আবার বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার কিছু লাগবে না।' কথাটা এমন ভাবে বলল সে, যেন কমলাকে হয় বসতে না-হয় চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বলল।

কমলা বসল না, বলল, 'আমার জন্যে মাথা ব্যথার দরকার নেই।'

তাকাল সুশীতল। কমলার মুখ গম্ভীর, চোখে রাগ, ঠোঁট শক্ত। গলার স্বর রুক্ষ। কিছু বলতে যাচ্ছিল সুশীতল, সামলে নিল। বলল,

'তাহলে বস।'

'তুমি খাও, আমার দিকে না তাকালেও চলবে—।'

'তুমি এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

এবার যেন কি ভাবল কমলা, ভেবে চেয়ারে বসল।

সুশীতল খাওয়া শুরু করল আবার। খেতে ইচ্ছে করছিল না অবশ্য। হয়তো এতটা রাত হবার দরুণ খিদে মরে গিয়েছিল। কিংবা কমলার ব্যবহারে তার বিরক্তি বাড়ছিল বলেই খেতে ইচ্ছে করছিল না। খাবার-দাবারও সব ঠাণ্ডা।

কমলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'মধ্যমগ্রামের দিকে।'

'সেখানে কি?'

'কাজ ছিল।'

'সারাদিনেও তোমার কাজ শেষ হয় না? রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাজ করে বেড়াতে হয়?'

সুশীতল মুখ তুলল না, না তুলেই বলল, 'পেটের দায়...।'

কমলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সামান্য পরে বলল, 'ওই একটা কৈফিয়ত দিয়ে বেশ চালাচ্ছ।'

এবার মুখ তুলল সুশীতল। কমলার চোখের দিকে তাকাতেই তার মনে হল, বড় বেশি তীক্ষ্ণ এবং কেমন যেন অবিশ্বাসের চোখে সে সুশীতলকে দেখছে। স্বভাবতই রাগ হল সুশীতলের: বলল, 'কৈফিয়ত দিচ্ছি মানে? কিসের কৈফিয়ত?...তুমি কি ভাবছ আমি দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই?'

'আমার জানার দরকার নেই,' কমলা ঠাণ্ডা গলায় বলল।

সুশীতল মাথা গরম করার ছেলে নয়, তবু কমলার কঠিন, রুক্ষ, ঠাণ্ডা ব্যবহারে তার রাগ বাড়ছিল, বলল, 'দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে পায়ের জুতো ক্ষয়ে যাচ্ছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোড়দৌড় করছি, আর তুমি বাড়িতে বসে বসে আমার ওপর চোট দেখাচ্ছ!'

কমলা কথাটা শুনল। গালের একটা পাশ কেমন বেঁকে কুঁচকে

গেল, যেন বিদ্রূপ করছে, বলল, 'তোমার ওপর কোন কিছু দেখাবারই মালিক আমি নই। উলটে তুমিই আমায় দেখাচ্ছ। এ-বাড়িতে আমি তোমাদের ঝি-বামুনের চাকরি করি। এখন দেখছি আমার চাকরিই হল রাত এগারোটা পর্যন্ত তোমার জন্যে হাঁড়ি আগলে বসে থাকা। সে আমার শরীর খারাপ থাকুক, জ্বরজ্বালা হোক আর যা-ই হোক না কেন।'

সুশীতলকে যেন ঠাস করে চড় মেরেছে কমলা, কেমন অপ্রস্তুত এবং অপমানিত হয়ে কোন কথা সে বলতে পারল না। কমলার দিকে তাকাল। প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও সুশীতল হঠাৎ লক্ষ্য করল, কমলার মুখ বেশ শুকনো, খড়ি ওঠা মুখ যেমন হয়, চোখ চকচক করছে, চুল রুক্ষ। কমলার চোখের তলায় বরাবর কালির দাগ ধরে, আজ আরও কাল্‌চে দেখাচ্ছে। কিছু বলতে যাচ্ছিল সুশীতল, থেমে গেল। সন্দেহ হল, কমলার শরীর খারাপ। জ্বরজ্বালা হয়েছে ?

মুখ নামিয়ে সুশীতল, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে লাগল। 'তোমার কি শরীর খারাপ ?'—এই কথাটুকু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না।

দুজনেই চুপচাপ। সুশীতল কোন রকমে খাওয়া শেষ করছে, কমলা চুপ করে বসে। কিছুক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে সুশীতল নীচু গলায় বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ ?'

কমলা জবাব দিল না।

জল খেল সুশীতল, কমলার দিকে তাকাল। 'শরীর খারাপ নিয়ে বসে থাকার কোন দরকার ছিল না। খাবার বেড়ে চাপা দিয়ে রাখতে পারতে।' বলে উঠে দাঁড়াল। আবার বলল, 'তুমি আমার চাকরি কর না। তোমায় চাকর রাখার মতন মনোবৃত্তি আমার নেই।'

আর দাঁড়াল না সুশীতল, মুখ ধোবার জন্যে চলে গেল।

কমলা এঁটো থালা বাটি গুছিয়ে নিতে লাগল চুপচাপ।

ঘরে ফিরে সুশীতল দরজা বন্ধ করে দিল। আলনায় ঝোলানো জামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করল।

কমলা এখন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রীতিমত বড় সমস্যা। সুশীতল সমস্যাটা অনুভব করতে পারছে, কিন্তু কী করবে, কী তার করা উচিত বুঝতে পারছে না। নিজের দশটা ঝামেলার মধ্যে সুশীতল এখন এমন করে জড়িয়ে আছে যে তার মনও ওদিকে যায় না। পিসীমার ওপরই মাঝে মাঝে রাগ হয় তার। কমলাকে এ-বাড়িতে না আনলেই ভাল ছিল। যদি বা আনাই হল, পিসীমার এভাবে ওকে নিয়ে নাচানাচি করা, ওর হাতে সমস্ত ছেড়ে দেওয়া অনুচিত হয়েছে।

সুশীতল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। নীচে গলি। ওপাশে মণ্ডলদের বাড়ি। বাড়িটার তামাম জায়গায় যত্রতত্র প্লাস্তারা লাগানো, এক একটা পাশ প্রায় ভেঙে পড়েছে, জানালাগুলোয় কোন রঙ নেই, রোদে জলে বিচিত্র হয়ে কোন রকমে ঝুলছে। রাত্রে অবশ্য বাড়ির কিছু দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একটা কাল্‌চে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত সিগারেট টানল সুশীতল জানালায় দাঁড়িয়ে। সবে এল। গরম এখনও যায় নি কলকাতায়। অথচ তখন বিরাটির কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেমন ঠাণ্ডা লাগছিল। কলকাতায়, এই চাপা গলিতে বাতাস কই।

পাখাটা খুলে দিল সুশীতল। খুলে দিতেই শব্দ হতে লাগল। শব্দটা এমন বেয়াড়া যেন কোন কচি বাচ্চার গলা আটকে গিয়ে কাঁদছে। একেবারে কুৎসিত। এই শব্দের জন্যে সুশীতল পাখাটা খুলতে চায় না। তার চেয়ে গরম সহ্য করা ভাল। কিন্তু রাত্রে শুতে গিয়ে পাখা না খুলে উপায় কি।

পাখা খুলে বাতি নিবিয়ে সুশীতল তার খাটে চলে এল। এসে শুয়ে পড়ল। হাতে সিগারেট। সারাদিন পরে গা হাত ছড়িয়ে শুতে আরামই লাগল। ক্লান্তিও কম নেই শরীরে। দিনভোর টো টো, চড়া রোদে ঘোরা, আবার কখন এক পশলা বৃষ্টি এসে গেল, তাতে

ভেজো। শরীরটা যে এ সব করেও টিকে আছে এই যথেষ্ট।

কমলার কথাই ঘুরে ফিরে আবার মাথায় এল। সুশীতল অনুভব করল, এতক্ষণ কমলা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সে আজ রাত্রে খেল কি খেল না, কে জানে। হয়তো সত্যিই শরীর খারাপ কমলার, জ্বরজ্বালা হয়েছে। সুশীতল জানতে পারল না বাস্তবিকই জ্বর-টর হয়েছে কিনা কমলার। কাজটা কি অন্যায় হল? যদি অন্যায় হয়েও থাকে—সুশীতলের করার কিছু নেই। সে কেমন করে জানবে কখন কার জ্বর হচ্ছে! বাড়িতে কতক্ষণ থাকে সুশীতল? কমলারই বলা উচিত ছিল তার কী হয়েছে।

পিসীমাই এ সব ব্যাপারের মূল। পিসীমা না থাকলে, কিংবা কমলাকে দেখে হায় হায় না করলে কমলা এখানে থাকত না। পিসীমাই ব্যাপারটা পাকা করে দিল, নয়তো সুশীতল কমলাকে রাখত না, তারও থাকার কথা উঠত না।

সুশীতল বিছানার একপাশে গড়িয়ে এসে মাটিতে হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিবিয়ে দিল। দিয়ে আবার সোজা হয়ে শুলো।

কমলা এসেছে আজ প্রায় বছর দেড়েক। কোথাও কিছু নেই একদিন ঘনঘোর বর্ষায় শৈলদা একটা পুরোনো স্যুটকেশ, পাতলা এক বিছানা আর তার বউ কমলাকে নিয়ে এ বাড়িতে হাজির। শৈলদা সুশীতলের মাসতুতো দাদা। অবশ্য মার খুড়তুতো দিদি—নিজের নয়। বরাকরের দিকে থাকত, কুমারডুবির কোন্ ফায়ার ব্রিক্সের কারখানায় কাজকর্ম করত। কাজকর্ম বলতে রাজনীতি, শ্রমিক-ট্রমিকদের নেতা হয়েছিল। এ সব খবর সুশীতলরা রাখত না, পরে শৈলদার মুখে শুনেছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতন শৈলদা বছর কয়েক এই সব করেছিল। তার ভাগ্যও নাগরদোলার দোলনার মতন একবার উঁচুতে আবার নীচুতে, পরে আবার মাঝামাঝি উঠে একে-বারে মাটিতে নেমে এলো। বার দুই জখমও হয়েছিল শৈলদা। শেষে সমস্যা দাঁড়াল জীবন মরণের। শ্রমিক রাজনীতির জন্যে তার পায়ের তলায় দাঁড়াবার মাটি তো ছিলই না, উপরন্তু বড় রকম ব্যাধিই বাধিয়ে

ফেলেছিল পেটের। চেহারা দেখলেই মনে হবে, যে কোন সময় মারা যেতে পারে, বোধ হয় মণ খানেকেরও কম শরীরের ওজন, রোগা লিকলিক করছে, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে। কলকাতায় এসেছিল কোথাও যদি বিনি পয়সায় ভরতি হয়ে রোগটা সারাতে পারে। সুশীতল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ন্যাশনালে ভরতি করে দিয়েছিল শৈলদাকে। মাস দেড়েকও থাকতে হল না, রক্ত-টক্ত বমি করে, পায়খানা করে মারা গেল।

কমলাকে নিয়ে হল সমস্যা। যাবে কোথায়? বাপের বাড়িতে থাকার মধ্যে এক ভাই, সে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়েছে, মানে কোন রকমে একটা চাকরি-বাকরি করে পেট চালায়, দিদির সঙ্গে সদ্ভাবও নেই। কুমারডুবিতে ফিরে গিয়েও কমলার কোন লাভ ছিল না। জলে পড়ল কমলা।

পিসীমার মায়া-দয়া বেশ বেশী। তাছাড়া শৈলদার মা মানে মালতী মাসী ছিল পিসীমার এক সময়কার বন্ধু। পিসীমা গা পেতে দায় নিল কমলার। বলল, 'ও আর যাবে কোথায়, এখানেই থাক, দুটো পেট যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানে তিনটে পেটও চলে যাবে। ঝাড়া হাত-পা বউ মানুষ, ওকে তো রাস্তায় ঠেলে দেওয়া যায় না। অধর্ম হবে। তুই বরং শেতল, বউমাকে একটা কিছু জোগাড় করে দে, লেখাপড়া জানা মেয়ে, নিজেও চালিয়ে নিতে পারবে।'

সুশীতল আজ যা-ই ভাবুক, কমলার ওপর যতই রাগ হোক, তখন পুরোপুরি সহানুভূতি বোধ করেছিল। সত্যিই তো, যাবে কোথায় কমলা? আপাতত এ বাড়িতেই থেকে যাক, পরে দেখা যাবে।

সুশীতলের কাছে কমলাকে তখন ঠিক দায় বা ভার বলে মনে হয় নি। কেননা ও তখন সত্যি সত্যিই বার্ড কোম্পানিতে ভাল চাকরি করত। কেটেকুটেও পকেটে আটশো ন'শো মতন আসত। দর্জি-পাড়ার এই পুরনো বাড়ির দোতলার ভাড়াও সেই পুরনো আমলের, মাত্র ছিয়াত্তর টাকা। বাড়িতে থাকার মধ্যে সে আর পিসীমা। সংসারে আর একজন বাড়তি লোক হল বলে সুশীতল গ্রাহ্যও করে নি।

এই ভাবে কমলা এ-বাড়িতে এলো। প্রথম দিকে সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। এতই ভাল যে, সুশীতল গোড়ার দিকে 'বউদি' বলে কমলাকে ডাকলেও পরে আর ডাকত না। কমলাও বৌদি বলা পছন্দ করত না। বয়েসে এক আধ বছরের ছোটই হবে কমলা, শৈলদাও বয়েসে এমন কিছু বড় ছিল না সুশীতলের চেয়ে। সুশীতল আর বউদি বলত না কমলাকে।

কমলার কাছ থেকেই সুশীতল ধীরে ধীরে শৈলদা-কমলার বিয়ে-থা, সংসার ধর্ম পালন থেকে শুরু করে শৈলদার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে আসা পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনেছে। এবং বুঝতে পেরেছে, কমলা কোন সময়েই স্বামী নিয়ে সুখী বা তৃপ্ত ছিল না, পছন্দও করে নি শৈলদাকে।

সুশীতলের মনে হয়েছিল, কমলার এই স্বামী-বিরাগ স্বাভাবিক। কোন দোষ তার নেই।

গোড়ায় গোড়ায় কমলার সঙ্গে সুশীতলের সম্পর্ক যত ভালই থাকুক পরে আর তা থাকল না। কী কারণে তা বলা মুশকিল।

সুশীতল একদিন মাথা গরম করে, অফিসে ঝগড়াঝাটির জন্যে চাকরি ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে ভাবল, চুলোয় যাক তার চাকরি, অমন চাকরি সে কয়েক ঘণ্টায় জুটিয়ে নিতে পারবে। যদি না জোটে ব্যবসা করবে।

চাকরি ছাড়ার পর সুশীতল দেখল ব্যাঙ্কের পাশ-বইয়ে তার হাজার তিনেক টাকা জমানো আছে। মাস দুই চলে যাবে ওতে হেসে খেলে। আর মাস দুইয়ের মধ্যে কি সে অন্য একটা কিছু জোগাড় করতে পারবে না?

নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে সুশীতল প্রথম প্রথম অনেকটা হেলায়-ফেলায় চাকরি খোঁজা শুরু করল। কিন্তু দিন পনেরো হাঁটা-হাঁটি করেই তার হেলা-ফেলা ভাবটা কেটে গেল; বুঝল, চাকরি পাওয়া তত সোজা নয়। বন্ধুরা বলল, শালা, খুব তেজ হয়েছিল তখন, এখন বোঝ।

চাকরি জিনিসটা যে কত পিছল সুশীতলের বুঝতে সুঝতে ব্যাঙ্কের তলানি শেষ। এবার কপালে ঘাম দেখা দিল। কা বোকামিই করেছে সুশীতল ওপরঅলার সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে। তার যা গুণ, বিদ্যার কিংবা অ-বিদ্যার, তাতে এ-বাজারে চাকরি জোটে না। যা-ও বা জোটে মাইনে মেরে-কেটে শ'চারেক। সুশীতল আর পাঁচজনের মতন তার রাজার দর আগের মাইনেতে বেঁধে রেখেছিল। সেটা তার কৌলিন্য, কৌলিন্য ছাড়তে সে রাজী হল না।

এই ভাবে টেনে-টুনে মাস চারেক কাটানোর পর সুশীতল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, চাকরি নয়, ব্যবসাই করবে সে। পুঁজি অবশ্য নেই। কিন্তু তেমন যোগাযোগ ঘটে গেলে কিছু পুঁজি সে জোগাড় করতে পারবে। বন্ধু বান্ধব আছে, একটা ইনসিওরেন্স আছে, ধার নেবে পলিসি বন্ধক রেখে। তাছাড়া মার সামান্য কিছু গয়নাগাটি আছে, কেউ তাতে হাত দেয় নি। সুশীতল তাও বেচে বুচে নিশ্চয় কিছু পেতে পারে।

এই সব যখন চলছে, টানাটানি ছুটোছুটি, তখন কমলাকে একটা চাকরি গোছের জুটিয়ে দিয়েছিল সুশীতল। পাড়ার কাছাকাছি নার্সারি স্কুল খুলেছিল তুলসীর দিদি, দু-একজনকে নিচ্ছিল চেনাশোনা, সুশীতল কমলাকে ঢুকিয়ে দিল। মাইনে তেমন কিছুই নয়, শ'খানেক; তবু এই চাকরিটা কমলাকে আস্থা দেবে, তার সময় কাটবে, একটা কাজ গোছেরও পাবে। কমলা চাকরিটা নিয়েছিল।

এইখানেই মজা। তার নিজের চাকরি জুটল না, অথচ কমলা তার কপালে পেয়ে গেল। সুশীতল ঠাট্টা করে বলেছিল, 'মেয়ে হয়ে জন্মালেই পারতাম!'

কমলা বলেছিল, 'পরের জন্মে সাধ মিটিয়ে নিও।'

'অগত্যা তাই,' সুশীতল হেসেই বলেছিল

পরের জন্মের কথা থাক। এ-জন্মেই সুশীতল বেশ প্যাঁচে পড়ে গেছে। আজ ছ'মাস তার কোন কাজকর্ম নেই। সারাটা দিন নানা ফন্দিতে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে কমলার সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে

যাচ্ছে। পিসীমাও দিন দিন অশক্ত অপটু হয়ে পড়ছে। এই সব ঝামেলা সহ্য করতে সত্যিই আর পারছে না সুশীতল।

আজ একটা যোগাযোগ ঘটার কথা ছিল। তাদের এক বন্ধু, বংশী বলেছিল, মধ্যমগ্রামে তার বাড়িতে আসতে। কোন্ এক সাহা বংশীদের প্রতিবেশী, দহরম মহরম আছে, একটা বালতির কারখানা খোলার কথা আছে। পয়সা-কড়ি আছে যথেষ্ট। সুশীতল সব ব্যাপারেই কেশবকে মুরুব্বি ধরে। কেশবকে সঙ্গে নিয়ে ছুটেছিল মধ্যমগ্রাম। গিয়ে বুঝল, ব্যাপার সোজা নয়। সহজ কথা; যাওয়াই সার হল।

আর শালা কেশব কিনা অক্লেশে সেই মোটরঅলাদের বলল যে সুশীতলের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল তারা! বলল, সুশীতল বার্ড কোম্পানিতে আছে। এ-রকম ডাহা মিথ্যা কথা কেশব বলতে পারে সুশীতল বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়েছে।

তিন

সপ্তাহ খানেক পরে মিহিরের স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে সুশীতলের আবার দেখা হয়ে গেল। সুশীতল কলেজ স্ট্রীটে গিয়েছিল একটা কাজে, কাজ চুকিয়ে ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে—হঠাৎ কে যেন তার পাশ থেকে কথা বলল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। প্রথমটায় খেয়াল করতে পারে নি, পরে বুঝতে পারল। মিহিরের স্ত্রী প্রীতি দাঁড়িয়ে, পাশে আরও একটি মেয়ে।

সুশীতল সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করে বলল, 'আপনি?'

প্রীতির চোখমুখে সাধারণ হাসি, সামান্য কৌতুক। বলল, 'ভাবছিলাম চিনতেই পারবেন না! কেমন আছেন?'

'ভালই। আপনাদের সব ভাল?'

প্রীতি একপাশে সামান্য মাথা হেলাল। তারপর পাশের মেয়েটিকে দেখাল, বলল, 'আমার ছোট ননদ, জবা।' বলে মেয়েটিকে সুশীতলের পরিচয় দিল।

সুশীতল জবাকে এক নজর দেখে নিল। ভালই লাগে দেখতে। চেহারায় কোথাও কিছু আছে—চোখ টেনে নেয়। সুশীতল প্রীতির দিকে তাকাল। 'আপনি এখানে?'

'একটু কেনাকাটি করতে এসেছি। এই তো ট্রাম থেকে নামলাম।'

'ও, আচ্ছা!' সুশীতল বলল, 'গাড়ি কোথায়?'

প্রীতি হাসিমুখেই বলল, 'নেই।…কাজকর্ম পড়লে উনি গাড়িটা একটু-আধটু বার করেন। আজকাল কি গাড়ি চড়া যায়!'

সুশীতল ফুটপাথের দিকে সরে এলো, প্রীতিরাও; একটা ট্যাক্সি গা ঘেঁষে ঘেঁষে আসছে।

প্রীতি বলল, 'কই, আপনি তো এলেন না? কেশববাবু কালকেও গিয়েছিলেন। এত কি কাজ আপনার! আসুন না একদিন।'

সুশীতল মাথা নাড়ল। 'যাব। সময় পাচ্ছি না। যাব।'

প্রীতি আরও দু-একটা কথা বলে চলে গেল, আবার অনুরোধ করে গেল বাড়িতে যাবার জন্যে। সুশীতল মাথা নোয়াল, নাড়ল, যেন সত্যি সত্যি সে যাবে। যাবার সময় জবা একবার সুশীতলের দিকে তাকাল। পরিচিতকে মানুষ যেভাবে দেখে সেই রকম চোখেই।

ট্রাম এলে সুশীতল উঠল। সে এসপ্ল্যানেড যাবে।

এখন বিকেলের গোড়ায় এই ট্রামে ততটা ভিড় নেই। বসবার জায়গাও পেল। ধর্মতলায় নামবে সুশীতল। কল্যাণের অফিসে যাবে। সেখানে একটা খবর পাবার কথা। কল্যাণ পাঁচটার মধ্যে যেতে বলেছে। কল্যাণের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে সুশীতল কার্জন পার্কে গিয়ে মাঠে বসবে, কেশব অফিস ফেরত মাঠে আসবে বলেছে।

ট্রামে যেতে যেতে সুশীতলের মাঝে মাঝে প্রীতির কথা মনে পড়ল। মহিলার মধ্যে চমৎকার একটা ঘরোয়া অথচ অভিজাত ভাব আছে। দেখতেও ভাল, লম্বা দোহারা গড়ন, মুখটি হাসিখুশি; সেদিন অতটা লক্ষ না করলেও আজ সুশীতল লক্ষ করেছে, মহিলা সত্যিই আলাপী, কথা বলার মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গ ভাব আছে। মহিলার ননদটিও ভাল দেখতে। শান্তশিষ্ট বলে মনে হয়।

এরই পাশাপাশি কমলার কথা একবার মনে পড়ল সুশীতলের। কমলার সঙ্গে তার মন কষাকষি যদিও এখন আর চলছে না, তবু কমলাকে প্রীতিদের পাশাশাশি পছন্দ হল না সুশীতলের।

মাঠে এসে কেশব বলল, 'চা-টা খেয়েছিস?'

ঘাড় নাড়ল সুশীতল। 'কল্যাণের অফিসে খেয়েছি।'

'তা হলে ওঠ্; ছটা বাজে।'

'উঠব ? কোথায় যাবি ?'

'সিনেমা। টিকিট আছে।'

'সিনেমা ?'

'চল শালা, জেমস্ বণ্ড··· ।'

সুশীতল উঠল। জেমস্ বণ্ড নিয়ে তার তেমন কোন আগ্রহ নেই। সময় কাটাবার জন্যে এক আধটা পড়েছে। বলল, 'তুই ফট্ করে সিনেমার টিকিট কাটলি কেন ?'

'কাটলাম। অনেকদিন ইংলিশ দেখা হয় না,' কেশব রসিকতা করে বলল, 'আর বাংলা তুই এ পাড়ায় কোথায় পাবি ! জেমস্ বণ্ড দারুণ। ডক্টর নো পড়েছিস ?'

কোন জবাব দিল না সুশীতল।

কেশব একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। 'কল্যাণ কি বলল রে ?'

'এখনও ম্যানেজ করতে পারে নি।'

'ব্যাটা ব্লাফ ঝাড়ছে নাকি ? নে, সিগারেট নে।'

সুশীতল সিগারেট নিতে নিতে বলল, 'ব্লাফ ঝাড়বে না। সে টাইপ ও নয়। তবে পার্টিকে ও বাগাতে পারছে না।'

'পারবেও না। কল্যাণটা গাধা।' কেশব সিগারেট ধরিয়ে নিল।

ট্রাম, বাস, ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পেরিয়ে এপারে এল সুশীতলরা। পাশাপাশি হাঁটা যায় না। এই সময়টা যেন কলকাতার এই এলাকা মানুষের মাথার সমুদ্র, গাড়ি-ঘোড়াগুলো এমন ভাবে যায় দেখলে মনে হবে মানুষের সমুদ্র দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

সুশীতল হঠাৎ বলল, 'ওই মহিলার সঙ্গে আজ দেখা হল।'

তাকাল কেশব। 'কোন্ মহিলা ?'

'সেই যে গাড়ির মহিলা, মিহিরবাবুর স্ত্রী।'

'আচ্ছা !···কোথায় দেখা হল ?'

'কলেজ স্ট্রীটে। বিকেলে। কল্যাণের অফিসে আসবার আগে।'

কেশব বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেন যেন হাসল।

'হাসছিস যে?' সুশীতল জিজ্ঞেস করল।

'কেস্ আছে।'

'কি কেস্?'

'বলব। চল আগে বসি।'

'তুই কাল আবার ও-বাড়ি গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে বেশ খাতির জমে গেছে। মিহিরবাবু তাস-পাগলা। কাল প্রায় দশটা পর্যন্ত তাস পিটেছি। তুই বেটা তাসটাও শিখলি না।'

সুশীতল কথা বলল না। তাসটা সত্যিই সে জানে না, জীবনে বড় বড় অনেক কিছুই না জানার জন্যে সুশীতলের যেমন দুঃখ নেই, তাস পাশা না জানার জন্যেও তার দুঃখ হবার কথা নয়।

সিটে বসে ক্লান্তিটা একটু যেন ভেঙে নিয়ে কেশব বলল, 'তোকে একটা খবর দিতে পারি।' বলে হাসল।

'কি খবর?'

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে কেশব রগুড়ে চোখে দু'মুহূর্ত দেখল, তারপর বলল 'বিয়ে করবি?'

সুশীতল ভাল বুঝতে পারল না, অবাক চোখে বন্ধুকে দেখতে দেখতে বলল 'বিয়ে? আমি!' বলে কি মনে পড়ায় হাসল, 'আবার কি কোথাও মেয়ে দেখতে যাবি নাকি?'

কেশব একটু রহস্যময় হাসি হাসল। 'মেয়ে আছে, ভাল মেয়ে।'

ততক্ষণে ঘর অন্ধকার। লোক ঢুকছে। সুশীতলকে গুটিয়ে বসতে হল, পাঁচ সাতজনের একটা দল, গোটা দুই মেয়েও রয়েছে, প্রায় পা মাড়িয়ে দিয়ে পাশের সিটে চলে গেল।

বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে সুশীতল বলল, 'তুই কি ঘটকালির বিজনেস করছিস?'

কেশব মন দিয়ে স্নো-ক্রীমের বিজ্ঞাপন দেখছিল। রসিকতার গলায় জবাব দিল, 'তোর ঘটকালি করব ভাবছি। সত্যি, তুই যদি রাজী থাকিস এখুনি লাগিয়ে দেওয়া যায়।'

'তোর ফী কত?' হাসল সুশীতল।

'বেশী না।' বলে সুশীতলের গা টিপে চাপা গলায় একটা বিশ্রী কথা বলল কেশব।

সুশীতল হাসল। কেশব আর কথা বলছিল না। বিজ্ঞাপন দেখছিল আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিল।

ইন্টারভ্যাল হল। বাতি জ্বলল আবার। হলের চারদিকে তাকিয়ে কেশব বলল, 'ফুল হাউস! জেম্‌স বণ্ড কেমন পপুলার দেখেছিস?'

'দেখছি।'

'আমাদের বাঙালীদের, শুধু বাঙালী কেন, এদেশের লোকদের লাইফে কোন অ্যাডভেঞ্চার নেই, মাল, মেয়েছেলে, মারদাঙ্গা এ না হলে জীবন! তা তুই যে রকম ভীতু টাইপের তোর এ সব হবে না।'

'তোর হবে?' সুশীতল হাসল।

'প্রথম দুটো হবে,' কেশব হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, 'প্রীতিবউদির সঙ্গে তোর শুধু দেখাই হল, না, আর কিছু হল?'

'প্রীতিবউদি?' সুশীতল অবাক হবার ভান করল।

কেশব বলল, 'ও আমি বউদি পাতিয়ে ফেলেছি। দিদি পাতালেও পারতাম। বাঙালী মেয়েদের ম্যানেজ করতে আমার বেশী দেরী হয় না।'

'দেখছি তো তাই,' হাসল সুশীতল।

'কেমন দেখলি?' কেশব চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল।

সুশীতল কেমন অপ্রস্তুত বোধ করল। 'মানে?'

'মানে তোর যদি ইচ্ছে থাকে বল, লাগিয়ে দি। ভাল মেয়ে, ভাল ফ্যামিলি।' কেশবের গলার স্বর হালকা। ঠাট্টাই করছে।

সুশীতলও ঠাট্টার গলায় বলল, 'আমার ইচ্ছে থাকলেই হবে?'

'অফকোর্স।'

'কেমন করে ?'

কেশব বন্ধুর দিকে তাকিয়ে এবার যেন গম্ভীর চালে বলল, 'প্রপোজাল আছে।'

সুশীতল ঠাট্টার গলাতেই বলল, 'তাহলে লাগিয়ে দে।'

আর কথা বলা গেল না। ছবি শুরু হয়ে আসার সময় হল।

সিনেমা থেকে বেরিয়ে চা খেল দু' বন্ধু। তারপর ট্রামের জন্যে হাঁটতে লাগল।

সুশীতল কল্যাণের কথা বলছিল। কাজকর্মর কথা। কল্যাণের ওপর ভরসা থাকলেও তার পার্টির ওপর তেমন ভরসা সুশীতলের নেই।

কেশব শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, 'তুই ভাবছিস আমি ইয়ার্কি মারছি! সত্যি সত্যি তোর বিয়ের প্রপোজাল রয়েছে।'

সুশীতল বোকার মতন তাকাল বন্ধুর দিকে।

কেশব বলল, 'ব্যাপারটা ইয়ে হয়ে গেছে, মানে কমপ্লিকেটেড। প্রীতিবউদি ভেবেছে, আমরা সেদিন সত্যিই মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম তোর জন্যে। আমায় বারকয়েকই জিজ্ঞেস করেছে মেয়ে পছন্দ হয়েছে কিনা ? আমি বলেছি, না।'

কেশব হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বন্ধুকে দিল। নিজেও নিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে কেশব বলল, 'কালই প্রীতিবউদি আমায় বলছিল, দেখুন না, আমারও তো ননদের বিয়ের জন্যে একটি ভাল ছেলে খুঁজছি, আপনার বন্ধুর কাছে কথাটা পেড়ে দেখুন না।'

সুশীতল থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।—'যাঃ!'

মাথা নাড়ল কেশব। 'সিরিআসলি বলছি।'

এ রকম অবিশ্বাস্য কথা শুনে সুশীতল নিজেই বোকা হয়ে থাকল। কেশব হাঁটতে লাগল, সুশীতলও।

সামান্য এগিয়ে এসে কেশব বলল, 'কে জানত মাইরি, সেদিনের ব্লাফটা এ-রকম ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।'

সুশীতল কেন যেন অপ্রসন্ন হল। বলল, 'তোর এই যে বকবক, যেখানে যা প্রাণে চাইছে বলে যাচ্ছিস, সব ব্যাপারে ছ্যাবলামি, এর রেজাল্ট কেমন হয়, বোঝ। তুই কেশব, কোনদিন মানুষ হবি না।'

কেশব চুপ করে থেকে অভিযোগটা যেন মেনেই নিল। ততক্ষণে ট্রাম গুমটির কাছাকাছি এসে গিয়েছে ওরা।

সুশীতল বলল, 'ভদ্রমহিলার কাছে তুই কি পজিসন করে দিলি আমার?'

কেশব ট্রাম খুঁজছিল। গোটা চারেক ট্রাম ঢুকছে গুমটিতে। সুশীতলের হাত ধরে টানল কেশব।

একটা পাঁচ নম্বর পাওয়া গেল। উঠে পড়ল দুজনেই।

আরও খানিকটা পরে ট্রাম যখন গুমটি ঘুরে আবার ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে, কেশব হঠাৎ বলল, 'বিয়েটা তুই করে ফেললেও পারিস—।'

সুশীতল প্রথমে বিমূঢ় পরে চটে গেল। বলল, 'চ্যাঙড়ামি করিস না।'

'কেন, চ্যাঙড়ামি কেন? তুই বেটা বিয়ে তো একদিন করবিই।'

'না, করব না।'

'আইবুড়ো থাকবি?'

'থাকব।'

'মুখে সকলেই বলে, কেউ থাকে না', কেশব হেসে বলল, 'মেয়েটা ভাল। বরাতে পাচ্ছিস, নিয়ে নে।'

'চুপ কর। শালা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পেছনে তালি, বিয়ে করব!'

'ওরা অবশ্য জানে তুই বার্ড-য়ে রয়েছিস।'

সুশীতলের মাথা এবার সত্যিই গরম হয়ে উঠল। 'তুই পয়লা নম্বরের হারামজাদা।'

কেশব এ-রকম অবস্থাতেও হাসল। বলল, 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন বলে একটা কথা আছে জানিস তো! চাই কি বিয়ে করলে দেখবি তোর একটা হিল্লে হয়ে গেছে।'

সুশীতল আর বন্ধুর দিকে তাকাল না। ব্যাপারটা তার খারাপ লাগছিল। কেশবের এই সমস্ত চ্যাঙড়ামি তার কোনদিনই ভাল লাগে না।

আরও খানিকটা রাস্তা শেষ হল। কেশব জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুশীতলকে দেখতে দেখতে বলল, 'পিসীমার খবর কি রে?'

'ভাল।'

'কমলার?'

সুশীতল মুখ ফেরাল। কেশবের চোখে কেমন যেন এক কৌতূহল।

'কমলা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'কেন?'

'সব সময়েই গণ্ডগোল বাধায়। কোন কারণ নেই। কি জানি ওর কি হয় আজকাল।'

কেশব কিছু বলল না, রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল।

কমলার কথায় সুশীতলের হঠাৎ যেন একরাশ অভিযোগ গলায় এসে গিয়েছিল; নিতান্ত ট্রাম—কিছু বলা যায় না এখানে—সুশীতল মুখ বুজে বসে থাকল।

চার

পূজোর মুখোমুখি এক আধ দিন কয়েক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেল ; তারপর আবার শুকনো দিন। সুশীতল গিয়েছিল খড়্গাপুর, সকালের গাড়িতে, ফিরল সন্ধ্যের দিকে। খুব বড় কিছু নয়, তবু একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে কিছু কাজকর্ম করছিল সে, 'মেশিন টুলস'-এর সেল্‌সম্যান হয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল। মনে মনে তখনও সে ভাবছে, একটা ছোটখাট কারখানা খোলার মতন কাউকে পেলে এই পরের দাসত্ব ছেড়ে দেবে।

বেরিয়েছিল কোন্ সকালে, ফিরল সন্ধ্যেবেলায়। ক্লান্ত। সামান্য জ্বর জ্বর লাগছিল। বাড়ি ফিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যখন চা খেতে বসেছে কমলা একটা চিঠি এনে হাতে দিল।

পিসীমা এতক্ষণ ঘরে ছিল, সবে উঠে গেছে। সুশীতল চিঠিটা হাতে নিয়ে কমলার দিকে তাকাল। পোস্টকার্ড।

চিঠিটা পড়তে দু' মুহূর্তও লাগবার কথা নয় ; সুশীতল যেন বার দুই তিন পড়ল। প্রীতির চিঠি। ছেলের জন্মদিনে একবার যেতে বলেছে বিশেষ করে। কেশবকেও বলে দিয়েছে সুশীতলকে যেন ধরে পাকড়ে নিয়ে যায়।

চিঠিটা পাশে রেখে দিল সুশীতল।

কমলা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে কৌতূহল। বলল, 'কে ?'

সুশীতল বলল, 'আলাপ হয়েছিল কিছুদিন আগে—।'

'শুনি নি তো !'

সুশীতল কী বলবে বুঝতে পারল না। পরে বলল, 'শোনাবার মতন কি আছে।' বলার পর তার কেমন খারাপ লাগল। কমলা কি

তার কাছে কৈফিয়ত চাইছে ? উপেক্ষার ভাব করল সুশীতল। 'আর চা আছে ? দেবে খানিকটা ?'

কমলা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চলে গেল।

বিছানার ওপরই বসে ছিল সুশীতল। মাথা সামান্য ধরা ধরা, ঘাড়ের দিকে ব্যথাও করছে। জ্বর হয়তো নয়, জ্বরের ভাব হয়েছে। আসলে সেদিনের বৃষ্টিতে বার বার মাথা ভিজিয়ে গলা-টলায় ঠাণ্ডা লোগছে বোধ হয়, কেননা পরের দিন গলা খুসখুস করেছিল।

প্রীতির চিঠিটা আরও একবার দেখল সুশীতল। কেশবের পাল্লায় পড়ে মাঝে একদিন সে প্রীতিদের বাড়িতে গিয়েছিল। তার সঙ্কোচ এবং আড়ষ্টতা ছিল প্রচুর। তেমন কিছু গল্পগুজবও করে নি। কিন্তু সুশীতল স্বীকার করল, এখনও স্বীকার করবে, মিহিরবাবুরা সত্যিই চমৎকার লোক, অত্যন্ত ভাল পরিবার। কলকাতার কোন কোন বড় পরিবারের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা আছে, সেটা কোন কথাই নয়, নিজেরাই চালে-চলনে, ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র ও ভাল। সাদাসিধে সরল ধরণের লোক। মন খোলা কেশবের সঙ্গে মিহিরবাবুর ভাব-সাব খুব জমে গেছে। দুজনেই তাসের পোকা। মিহিরদের নীচের ঘরে রোজই প্রায় তাসের আড্ডা বসে। কেশবও সেখানে আসা যাওয়া শুরু করেছে, প্রায়ই যায়।

প্রীতি—না প্রীতিবউদি মানুষটি পুরোপুরি ঘরোয়া। বাড়িতে দেখলে মনে হবে পাকা গিন্নী। দুটি ছেলেমেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলেটি ছোট। মেয়ের বয়েস বছর এগারো-বারো ; ছেলের বয়েস সাত-আট। ভীষণ দুষ্টু। দুরন্ত। সুশীতলকে খেলার মাঠের গল্প বলে বোকা করে ছেড়েছিল। বাবার সঙ্গে কখনো সখনো ফুটবল মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছে।

জবার সঙ্গে সুশীতল স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করতে পারে নি। তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না, জবাও শুনেছে কিনা যে প্রীতিবউদি সুশীতলের সঙ্গে তার বিয়ের একটা কথা পাড়ার চেষ্টা করছে। বোধহয় শোনে নি। জবাকে অকারণ কথা বলতে কিংবা

প্রগল্‌ভ হতে সুশীতল দেখে নি। ভদ্র, মার্জিত, ভাল মেয়ে বলেই মনে হয়েছে জবাকে। বরং এ-রকমও মনে হয়েছে তার, সুশীতল যদি চাকরি-বাকরি করত আগের মতন তবুও এই মেয়েটিকে সে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারত না। কেননা নিজেকে সুশীতল জবার ঠিক যোগ্য মনে করে না।

কমলা আবার চা নিয়ে এল। চা নিল সুশীতল।

কমলা দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য, তারপর বাঁদিকে সরে গিয়ে চেয়ারে বসল। 'পুজোর সময় আমি ক'দিন থাকব না।'

তাকাল সুশীতল। কমলার চোখ-মুখ দেখতে দেখতে বলল, 'থাকবে না মানে?'

'কলকাতায় থাকব না।'

'কোথায় যাবে?' সুশীতল অবাক। কমলার কোথাও যাবার জায়গা আছে বলে সে জানত না।

কমলা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবজ্ঞার ভঙ্গি ঠিক নয়। তবু অবজ্ঞার মতন দেখাল। 'যাব কোথাও।'

সুশীতল বিরক্ত বোধ করল। কমলা যেন ক্রমশই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। 'পিসীমাকে বলেছ?'

'না।'

'বাঃ! পিসীমাকে বল।'

'পরে বলব।'

সুশীতল নীচু মুখে চা খেতে লাগল। কমলার সঙ্গে বচসা করার ইচ্ছে তার নেই। কথায় কথা বাড়ে। গতকাল কিংবা পরশু কমলার মেজাজ কিন্তু ভালই ছিল। কোন গণ্ডগোল করে নি। আজ আবার শুরু করেছে। কখনও কখনও সুশীতলের সন্দেহ হয়, কমলার মাথার কি কোন দোষ আছে!

অশান্তি ঘটতে পারে ভেবে সুশীতল খুব সাবধান হয়ে গেল। কথাবার্তা পাল্টে নিয়ে বলল, 'খড়্গাপুরে আমি অনেক দিন পরে গেলাম। আজকাল অর্ধেক লোক দেখলুম দীঘায় যায়। গাড়ি থামতেই বাস

ধরবার জন্যে ছুটোছুটি।' অসংলগ্ন কথা। কোন অর্থ হয় না।
সুশীতল নিজেই চুপ করে গেল।

কমলা বলল, 'তোমার কাজকর্ম কেমন হল?'

'মন্দ নয়।'

'দুপুরে কোথায় খেলে? হোটেলে?'

'না, আমি স্টেশনে সেরে নিয়েছিলুম।'

কমলা এবার ওঠার ভান করল। সুশীতল যেন কমলাকে খুশি করতে চাইছিল। 'বসো না, রান্নাবান্না বাকি আছে নাকি?'

'না।'

'বসো', সুশীতল বলল। আবার একটু চুপচাপ। তারপর শুধলো, 'তোমার আজকাল কি হয়? কথায় কথায় রেগে যাও?'

তাকাল কমলা। সুশীতলের চোখে চোখ রেখেই তাকিয়ে থাকল: 'কিছুই হয় না—' বলে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মাথা নাড়ল সুশীতল। 'হয়।...আমি অবাক হয়ে যাই।...চাকরি বাকরি নেই—বেকার, সারাদিন বাইরে ঘোড়দৌড় করে বেড়াচ্ছি। আমার মেজাজ এমনিতেই খারাপ। তারপর বাড়িতে এসে যদি তোমার সঙ্গে অশান্তি করতে হয়, ভাল লাগে না। আমার সব সময় মনে হয়, তুমি আজকাল আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে আছ।'

কমলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কিছু যেন ভাবছিল। আড়চোখে সুশীতলকে দেখল দু' পলক; তারপর বলল, 'তোমার মনের বাহাদুরি আছে।'

সুশীতল ঠাট্টা বুঝতে পারল। রাগ করল না। বলল, 'তুমি যা-ই বল আমি আজকাল এটা বুঝতে পারি। আমি তোমায় মাঝে মাঝে নিশ্চয় জ্বালাই, রাত-টাত হয়ে যায় ফিরতে—কিন্তু আমার অবস্থা তো তুমি দেখছ!'

'দেখছি।'

'তাহলে বিরক্ত হও কেন?'

'স্বভাবের দোষ।'

সুশীতল কেমন থতমত খেয়ে গেল। কমলা এ রকম কাটা কাটা স্পষ্ট জবাব দেবে সে ভাবে নি। সুশীতল চাইছিল কমলা এখনকার মতন খানিকটা স্বাভাবিক হোক, অন্য পাঁচটা কথা বলুক। কমলাকে সে ভোলাবার চেষ্টা করছে, পারছে না। নিজেই যেন অখুশি হল সুশীতল।

চা শেষ হয়েছিল। উঠে গিয়ে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই খুঁজল। গলার জন্যে আজ খুব কমই সিগারেট খেয়েছে, এখন একটা খেতে ইচ্ছে করছিল।

সিগারেট ধরিয়ে আবার বিছানায় ফিরে এল সুশীতল। 'শরীরটা আজ খুব ম্যাজম্যাজ করছে', বলে কমলার দিকে তাকাল। 'জ্বর-টর হতে পারে।'

কমলা চুপ করেই থাকল।

সুশীতল ইচ্ছে করেই গা করল না। বলল, 'তোমার কাছে বড়ি-টড়ি থাকে না? মাথা ধরা, গা হাত পা ব্যথার?'

'থাকে। দেখছি কি আছে—।' কমলা জবাব দিল।

'পরে দেখ—শোবার আগে খেয়ে নেব।'

সামান্য পরে সুশীতল বলল, 'তুমি সত্যি সত্যি পূজোর সময় থাকছ না?'

'না।'

'কোথায় যাচ্ছ?' সুশীতল সাধারণ ভাবেই বলল, তার ধারণা কমলা কোথাও যাবে না, তার যাবার জায়গা নেই কোথাও, নেহাত রাগের মাথায় যেন কথাটা বলেছে ও।

কমলা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আশ্রমে।'

'আশ্রমে?' সুশীতল আকাশ থেকে পড়ল যেন। বিশ্বাস করল না।

'কেন? আশ্রমে যেতে নেই?' কমলা এমন ভাবে বলল, বোঝা গেল না, ব্যঙ্গ করল না সত্যি সত্যি সে আশ্রমে যাবার কথা ভেবেছে।

সুশীতল মাথা নাড়ল। 'তোমার আবার আশ্রম কোথায় ?' বলে হাসল।

কমলার মুখ আগের মতনই। গম্ভীর, কোথাও কোন মোলায়েম হাসিখুশীর ভাব নেই। কথার জবাবও সে দিল না।

সুশীতল যেন খানিকটা সাহস পেল। সিগারেট খেতে খেতে হেসে বলল, 'কোন গুরু-টুরু ধরেছ নাকি ? আজকাল গুরুদের পোয়া বারো।'

কমলা বলল, 'কাউকে না কাউকে ধরতে হয় আমাদের মতন মেয়েদের। এতদিন তোমায় ধরে ছিলুম, এবার গুরু ধরব।'

কথাটা সুশীতলকে ধাক্কা মারল। তাকিয়ে থাকল কমলার দিকে।

কমলাকে দেখলে সাধারণ ভাবে কিছুই মনে হয় না। মনে হয় না সে বিধবা, মনে হয় না জীবনের একটা পর্ব সে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে শেষ করে আজ অন্য জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কমলা থান পরে না। পিসীমা তাকে থান পরতে দেয় নি ; কমলাও পরে নি। সাধারণ হালকা রঙের শাড়ি তার পরনে। মাথার মাঝামাঝি সিঁথি। একটু মোটা দেখায়, মোটা আর সাদা। হাত ফাঁকা, বাঁ হাতে পাতলা রুলির মতন তিলমাত্র সোনা। কমলার মুখ পরিষ্কার, চৌকোণো, ছোট মুখ, কপালের দিকটা সামান্য ছোট হলেও চিবুকের গড়নটি চমৎকার। চোখ নাক ভাল। গড়ন ছিপছিপে। গায়ের রঙ শ্যামলা ধরনের।

সুশীতল কয়েক পলক দেখল কমলাকে। দুঃখই হল। বেচারীর সারাটা জীবন এই ভাবেই কাটবে, ফাঁকা ফাঁকা।

'তুমি কি সত্যি সত্যি আশ্রম, গুরু এই সব করবে নাকি ?' সুশীতল ঠাট্টার গলায় বলল।

'কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি ?'

'এমনিতে থাকার কথা নয় ; তোমার নিজের ব্যাপার। কিন্তু গুরু-ফুরু আমার বিশ্বাস হয় না। বাজে ব্যাপার।'

'কত আর বাজে হবে ?'

'মানে ?'

'সবই তো বাজে। এই সংসারটাই বা কি এমন আহা-মরি।'

সুশীতল চুপ করে গেল। কমলার গলার স্বরে তিক্ততা ছিল না। বরং উদাস শোনাল। কিন্তু তার কথার তলায় যে তিক্ততা ছিল তা অনুভব করা সুশীতলের পক্ষে কঠিন হল না। কোন সন্দেহ নেই, কমলা এ-কথাটা বলতেই পারে। তার জীবনের কোথাও আহা-মরি কিছু নেই।

সুশীতল সিগারেটটা নিবিয়ে দিল। তাকাল কমলার দিকে। বলল, 'না···মানে···মানে তোমার বেলা নিশ্চয় ভাল হয়নি ; তা বলে গুরু ধরলেই সব যে চুকে যাবে তাও তো নয়।'

কমলা আরও একটু বসে থেকে উঠে পড়ল। বলল, 'আগে ধরি পরে ভেবে দেখব।' বলে কমলা চলে গেল।

সুশীতল বিছানায় বসে থাকল। কমলা কি সত্যিই আশ্রমে-টাশ্রমে চলে যাবে নাকি ? ওর মতি-গতি আশ্রমে যাবার নয়, গুরু ধরবারও নয়। তবু ঝট করে যদি কিছু করে বসে সেটা অন্য কথা। মানুষের মর্জিতে হাত দেওয়া অনুচিত। কমলা বাচ্চা নয়, সুশীতল তাকে জ্ঞান দিতে পারে না বরং সংসারের ব্যাপারে জ্ঞান নিতে পারে। কাজেই কমলা যদি গুরু ধরে বা আশ্রমে যায় সুশীতলের কিছু করার নেই। কিন্তু কেন যাবে সেটা জানা দরকার।

সুশীতল অবশ্য বেশী সময় মাথা ঘামাল না, অন্য কাজ মনে পড়ল। আবার বিছানা থেকে উঠল, টেবিল থেকে কলম আর কাগজপত্র এনে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে হিসেবপত্র করতে বসল।

পাঁচ

পুজোর পর সুশীতল বেশ অসুবিধেয় পড়ে গেল। কেশব কলকাতায় নেই, বউ বাচ্চা নিয়ে বড় শালার সঙ্গে গিয়েছে কারমাটাঁড়। তার বউয়ের শরীরে রক্ত বাড়াতে হবে, ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে গাছ জন্মে গেল, জল বাতাস না বদলালেই নয়, এই সব বড় বড় কথা শুনিয়ে শালা কেশব পালিয়ে গেছে। এদিকে সুশীতল পড়েছে মুশকিলে। এখন ছুটিছাটার পালা শেষ হয়েছে। অফিস-টফিস আবার খুলেছে, হাই তোলার পর্ব অবশ্য এখনও চলছে।

সুশীতল অনেক দিন ধরে একজনের সঙ্গে একটা কথা চালাচ্ছিল, এবং ভেবেছিল অন্য পাঁচজনও যেমন শেষ পর্যন্ত পালিয়েছে—জীবন দত্তও সেই রকম পালাবে।

জীবন দত্ত অবশ্য এক সময়ে কলেজে সুশীতলদের সহপাঠী ছিল। তাতে কি? জীবন ব্যাংকে চাকরি করে, বাড়ির অবস্থা ভাল, হিসেবী এবং বুদ্ধিমান ছেলে, দশবার না ভেবে কাজ করে না। সেই জীবন দত্তই সেদিন কেশবের বাড়ি এসে বলে গেছে—সুশীতলকে বেলেঘাটায় জমি-টমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সে, পুরনো শেড সমেত, এখন সুশীতল লেগে পড়ুক।

কেশব না ফিরে আসা পর্যন্ত, সুশীতল কিছুই করতে পারে না। ওর পরামর্শ ছাড়া হুট করে কিছু করা উচিত নয়, চাকরি ছাড়ার সময় সুশীতল জেদের মাথায় কোন পরামর্শ শোনে নি কেশবের, এখন তাকে পস্তাতে হচ্ছে। কেশব যতই বক্কেশ্বর, নচ্ছার হোক—তার বুদ্ধি আছে, ভাল মন্দ ভাবতে পারে।

কারমাটাড় থেকে বার দুই চিঠি লিখেছে কেশব। জানিয়েছে তোফা আরামে আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, বউয়ের চেহারা ফিরছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুশীতল চিঠি লিখল, জীবন দত্তের কথা জানিয়ে।

কেশব জবাব দিয়েছেঃ ক'দিন অপেক্ষা কর, আমি ফিরছি। ফিরে গিয়ে কথা বলব।

কাজেই সুশীতল জীবনের কাছে যাব যাব করেও দিন দুই গেল না। এদিকে বাড়িতেও পিসীমার শরীর খারাপ হল। বুকে ব্যথা। ডাক্তার-টাক্তার ধরে আনল কেশব। বিশেষ কিছু নয়, তবু সাবধানে থাকতে বলল ডাক্তার।

এই সময় একদিন সুশীতল কোন কিছু না ভেবেই সন্ধ্যের দিকে প্রীতিদের বাড়ি চলে গেল। পুজোর পর যাওয়াই হয় নি।

বাড়িতে মিহির নেই, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় গিয়েছে। প্রীতিবউদি ছিল। জবাও।

প্রীতি হেসে বলল, 'আপনি কলকাতাতেই আছেন? আমি ভাবলুম, বন্ধুর সঙ্গেই বেড়াতে গিয়েছেন।'

সুশীতল বলল, 'না, আমি যাব বলি নি তো। কেশব গিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে।'

প্রীতি ঠাট্টা করে বলল, 'তা সত্যি। আপনার তো আবার শ্বশুর বাড়িও নেই।'

নিতান্ত হাসির কথা। প্রীতি হাসল। সুশীতলও। জবা ছিল, সে বোধ হয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে নিল।

প্রীতি বলল, 'তা বিজয়ার পর একবার দেখা করতে তো আসতে হয়।'

সুশীতল সামান্য বিব্রত ভাবে বলল, 'আসব ভাবছিলাম। বাড়িতে অসুখ।'

'কার?'

'আমার পিসীমার।'

'তাই নাকি ? কী হয়েছিল ?'

'বুকে ব্যথা। ডাক্তার বলছে হার্টটা একটু ডাইলেট করেছে। বুড়ো মানুষ।'

প্রীতি সহানুভূতির মুখ করল। 'কাজকর্ম করতে দেবেন না। বুড়ো বুড়িরা কথা শোনে না, আমার মাকে দেখে আমি বুঝতে পারি, বড় অবাধ্য। কত বকাঝকা খায়, তবু মা সারাদিন কিছু না কিছু করবেই। হাতে যদি কাজ না থাকে তো মুখ। বকবক করেই চলবে।'

জবা উঠতে যাচ্ছিল, প্রীতি বলল, 'তুই বোস। আমিই চা করে আনছি।'

প্রীতি চলে গেলে সুশীতল আবার বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করল। কথা বলতেও পারল না। জবা সামান্য তফাতে জানালার কাছে সোফায় বসে আছে। তার মাথার দিকে আলো। সুশীতল বুঝতে পারল না যে ছাপা শাড়িটা জবা পরে রয়েছে সেটা সিল্কের না সুতীর ; সবুজ কালোয় মেশানো নক্‌শা। চমৎকার দেখাচ্ছিল। মুখ সামান্য নীচু করে জবা বসে আছে। পায়ে চটি। শান্ত, স্থির, সামান্য কুণ্ঠিত চেহারা।

সুশীতল যেন ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। গলা পরিষ্কার করল। বলল, 'পুজো কেমন কাটল ?'

জবা চুপ। মনে হল কথার জবাব দেবে। অথচ দিতে কেমন সংকোচ বোধ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে জবা বলল, নীচু গলায়, 'ভাল।'

'অনেক ঠাকুর দেখলেন ?'

'কই আর', মাথা নাড়াল জবা, 'বউদির সঙ্গে দু-একদিন মাত্র বেরিয়েছি।'

আলাপ শুরু করে সুশীতল ক্রমশ সহজ হবার চেষ্টা করছিল। ঠাকুর পুজো, সাজগোজ, কলকাতার ভিড়, সপ্তমীর দিন বৃষ্টি, এ সব

ছোটখাট, তুচ্ছ, সাধারণ কথার পর সুশীতল অনেকটা সহজ হয়ে গেল। জবাকেও আর ততটা কুণ্ঠিত মনে হল না।

সুশীতল সাধারণ কথাবার্তার পর চুপ করে গেল। নতুন করে কথা খুঁজে পেল না। জবাও চুপ। কিন্তু সে আর মুখ নামিয়ে বসে নেই, মুখ তুলে সুশীতলের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্পষ্ট দৃষ্টি। সহজ। সোজাসুজি।

সুশীতল যেন আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। বলল, 'কেশব কালীপুজো নাগাদ ফিরবে।'

জবা মাথা নাড়ল। 'শুনেছি। দাদা বউদিকে চিঠি লিখেছেন।'

'কলকাতার বাইরে গিয়ে এতদিন কেমন করে থাকে মানুষ কে জানে' সুশীতল অল্প হেসে বলল, 'আবার চিঠি লিখেছে, খুব আরামে আছে।'

জবা যেন কি ভাবল। তারপর বলল, 'বাইরে বেড়াতে গেলে ভালই লাগে। আমরা পুজোর সময়, শীতকালেও গিয়েছি মাঝে মাঝে। দাদার এক বন্ধুর বাড়ি আছে মধুপুরে। বার দুই সেখানেও গিয়েছি।' বলে জবা সামান্য চুপ করল। 'আপনি বাইরে যান-টান না?'

'না। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে কোথাও যাই নি। আগে বন্ধুদের সঙ্গে এক আধবার গিয়েছি।'

'খাঁটি কলকাতার মানুষ।' জবা মুচকি হাসল।

সুশীতলও হাসল। 'আমি খাঁটি কলকাতার মানুষ নই, পরে হয়ে গিয়েছি। আপনারাই খাঁটি কলকাতার লোক।'

জবা হাসির মুখ করল, কোন কথা বলল না।

সামান্য পরেই প্রীতি এল। হাতে ট্রে। প্লেটে মিষ্টি-টিষ্টি। সুশীতলের সামনে বড় প্লেটটা নামিয়ে রাখল প্রীতি। কাঁচের গ্লাসে জলও এনেছে, নামিয়ে দিল।

সুশীতল বলল, 'এত মিষ্টি কে খাবে?'

'আপনি।'

'পাগল নাকি! আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'মোটেই অসম্ভব নয়। বিজয়ার পর এলেন, মিষ্টিমুখ না করলে হবে কেন?'

'অত পারব না।'

'পারবেন। বুড়ো তো আর হন নি যে মিষ্টি খেতে ভয় থাকবে। নিন, খান। ···জবা তুই চা-টা নিয়ে আয় না রে।'

জবা হাসিমুখেই উঠে পড়ল।

সুশীতল বলল, 'আমি সত্যিই এত খেতে পারব না। দু-চারটে তুলে রাখুন।'

জবা চলে যাচ্ছিল, প্রীতি একটা প্লেট পাঠিয়ে দিতে বলল।

'উনি একদিন মধ্যে আপনার খোঁজ করছিলেন,' প্রীতি বলল।

'কে?'

'আমার কর্তা,' প্রীতি হেসে ফেলল।

'মিহিরবাবু! কেন···?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না; তবে কার একজনের খবর জানার কথা বলছিলেন, কাজকর্মের ব্যাপারে, বললেন সুশীতল বলতে পারে, ওদের অফিসের লোক।'

সুশীতল চোখ সরিয়ে নিল। বিব্রত। সামান্য ভয়ের মতন লাগল। মুখের সাধারণ সহজ ভাবটা বজায় রাখার জন্যে আচমকা সচেতন হল। হবার পর অনুভব করল, গালের মাংস কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসছে।

প্রীতি বলল, 'আমি বললুম, আপনি হয়তো কলকাতায় নেই।'

সুশীতল তাকাল। 'কার খবর জানতে চাইছিলেন জানেন? কি ব্যাপার?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না। কোন কাজ-টাজের ব্যাপার হবে বোধ হয়।'

একটু চুপ করে থেকে সুশীতল বলল, 'অফিসের খবর-টবর আমি তেমন কিছু রাখি না। নানা রকম কারবার আছে ওদের। কোথায় কে কি কাজ করে বলা মুশকিল।'

সুশীতল বেশ বুঝতে পারছিল তার আর ভাল লাগছে না। প্রাতির সামনে বসে থাকতেও খারাপ লাগছে, অস্বস্তি হচ্ছে, অনেকটা চোর-চোর ভাব। কেশবের ওপর রাগ হচ্ছিল। কি বিশ্রী প্যাঁচে সে ফাঁসিয়ে রেখে গেছে। অকারণ এই অশান্তি আর ঝঞ্ঝাট! সুশীতল একবার ভাবল, প্রীতিকে সত্যি কথাটা বলে দেয়। বলে দেয় যে, কেশব সেদিন আগাগোড়া রসিকতা করেছিল তাদের সঙ্গে, মিথ্যে কথা বলেছিল; সুশীতল এক সময় সত্যি সত্যিই চাকরি করত, কিন্তু এখন করে না।

জবা এল। চা নিয়ে এসেছে। একটা আলদা প্লেটও।

প্রীতি কয়েকটা মিষ্টি সরিয়ে রাখল। 'এবার নিন। খান।'

সুশীতল হঠাৎ বলল, 'আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।' বলে একটা মিষ্টি তুলে নিল।

'আমরা একদিন আপনাদের বাড়ির গায়ে গিয়ে পড়েছিলাম।'

'আমাদের বাড়ির? কবে?'

'ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে .....'

গলা প্রায় কাঠ হয়ে এল সুশীতলের। চায়ের কাপ তুলে নিল। নিজেকে বড় অসহায়, নির্বোধ মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় এসে সুশীতল বেশ বিরক্ত বোধ করতে লাগল। কেশবের ছেলেমানুষি বা ভাঁড়ামি তার ভাল লাগছে না। বেশ তো একদিন, একদিন না হয় কেশব নিতান্ত বেকায়দায় পড়ে একটা মিথ্যে, ঝট করে যা মুখে এসেছিল, বলেই ফেলেছিল, কিন্তু তারপর সেই মিথ্যে সে সংশোধন করতে পারত। কেশবের সঙ্গে মিহিরবাবুদের পরিবারের মাখামাখি ভালই হয়ে গিয়েছে, কেশব যদি সেদিনের ঘটনার পুরোপুরি ব্যাপারটা বলে দিত ঝামেলা চুকে যেত। কেন কেশব বলছে না? কেন সুশীতলকে একটা মিথ্যের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে?

না, সুশীতল আর প্রীতিদের বাড়ি যাবে না। যাওয়া উচিত নয়। ভদ্রলোকের বাড়িতে এই ভাবে আসা-যাওয়া মানে তাদের ঠকানো। যদিও সুশীতল খুবই কম, বার দুই তিন ও বাড়িতে গিয়েছে তবু তার যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া বাস্তবিকই সে বিয়ে-টিয়ে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। পেটে ভাত জোটে না তো বিয়ে! একেবারে মামুলি ছেলে সুশীতল, তাদের ঘরবাড়িও নিতান্ত সাধারণ। একেবারে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের যা হয়, পুরনো ভাড়াটে বলে সামান্য ক'টা টাকা বাড়িঅলাকে গুঁজে দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এই বাড়িতে কিংবা এই পরিবারের মধ্যে জবা একেবারে বেমানান। সুশীতল জবার প্রেমেও পড়ে নি, তাকে বিয়ে করার কথা ভাবেই না। ভাবা উচিত নয়। জবা তার পক্ষে অতিরিক্ত; আর সে, সুশীতল, জবার পক্ষে সমস্ত দিক থেকেই অযোগ্য। কাজে কাজেই অকারণ একটা মিথ্যে এবং বাজে ব্যাপার জিইয়ে রেখে কী লাভ?

সুশীতল ট্রামে উঠল না, হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ রিক্‌শা থেকে কে যেন ডাকল সুশীতলকে। তাকিয়ে দেখে পুষ্পদি ডাকছে। সুশীতল অবাক হল। রিক্‌শা থামিয়ে ফেলেছিল পুষ্পদি।

'এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?' সুশীতলই বলল।

'কাছেই। তুমি?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'উঠে এসো।'

'রিক্‌শায়?'

'কী হয়েছে?'

সুশীতল অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল। পুষ্পদির সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও কদাচিৎ দেখাশোনা হয়। দোষ হয়তো কোন পক্ষেরই নয়, আজকাল পরস্পরের খোঁজ খবর রাখা মুশকিল।

রিক্‌শা চলতে শুরু করলে পুষ্পদি সুশীতলের বাড়ির খবরাখবর নিতে লাগল।

'বুড়ী পিসীমার ওপর আর ঝঞ্ঝাট চাপিও না', পুষ্পদি বলল, 'এবার রেহাই দাও।'

'পিসীমাকে তো আগেই রিলিজ করে দিয়েছি', সুশীতল ঠাট্টার গলা করে বলল।

পুষ্পদি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল সুশীতলকে। 'কোথায় আর দিয়েছ?'

'দিয়েছি। অনেক দিন দিয়েছি। তুমি আমাদের খোঁজ খবরই রাখ না।...'

'তুমিই রাখ নাকি? আমাদের সংসারে একের পর এক যা চলছে...! শ্বশুরমশাই অথর্ব পঙ্গু হয়ে পড়ে, দেওর রয়েছে হাসপাতালে, আলসার অপারেশন হয়েছে, এরই মধ্যে বড় ভাশুরের মেয়ে ছায়া এসেছিল, বাচ্চা-কাচ্চা হবার কথা, তাকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধল। এখন ওই সেনবাবুর নারসিং হোমে আছে। তার কাছ থেকেই ফিরছি।'

'কী হয়েছে?'

'বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

সুশীতল চুপ করে থাকল। মানুষের দুঃখ দুর্ভাগ্যের আর শেষ নেই। রিক্‌শাটা পুষ্পদির বাড়ির দিকেই যাবে, সোজা। আর একটু এগিয়ে নেমে পড়বে সুশীতল। নেমে বাঁ হাতি গলি ধরবে।

পুষ্প বলল, 'একদিন পিসীমাকে দেখতে যাব।'

'যেও।'

'ছায়া বাড়ি এলেই যাব।'

'বলব পিসীমাকে।'

একটু চুপ থেকে পুষ্পদি বলল, 'সেই মেয়েটা আছে না গেছে?'

সুশীতল তাকাল। 'কে? কমলা?' কানে ভাল লাগে কথাটা, তবু সুশীতল জবাব দিল।

'এখনও আছে?' পুষ্পদি সুশীতলের চোখ মুখ দেখতে লাগল সন্দেহের চোখে। বলল, 'ওকে কি তোমাদের কাছেই রেখে দেবে নাকি বরাবর?

'না, মানে, এখন তো আছেই। কোথায় বা যাবে? কমলা না থাকলে পিসীমারই ঝঞ্ঝাট বাড়ত।'

পুষ্পদি বলল, 'একটা জোয়ান বিধবা মেয়েকে বাড়িতে রেখে ভাল করছ না তোমরা। আজকাল কত রকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারী হয়—। তখন আর মুখ দেখাতে পারবে না।'

সুশীতল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। রাগও হয়েছিল তার। কোন কারণ নেই হঠাৎ কমলার প্রসঙ্গ কেন? সুশীতলদের সংসারের ভালমন্দ বোঝার তুমি কে? যদি কেচ্ছা কেলেঙ্কারী হয়, তাহলেও তোমাদের গা পুড়বে না তাতে। আসলে তোমরাই নানা ধরণের কেচ্ছা নিয়ে রয়েছ। তার দু-একটা সুশীতলের জানা। আরও কিছুটা যেতে পারত সুশীতল, গেল না; রিক্‌শা থামিয়ে নেমে পড়ল। বলল, 'আমি একটু কাজ সেরে ফিরব। তুমি যাও।'

'তাহলে আমি চলি। একদিন আসব।'

'এসো।'

রিক্‌শাটা চলে গেল। সুশীতল দু' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। সিগারেট ধরাল অন্যমনস্ক ভাবে।

পুষ্পদির সঙ্গে তার দেখা হল, কি-ই বা লাভ হল তার সে বুঝল না। মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। কমলার কথা টেনে আনার কী দরকার ছিল পুষ্পদির? তুমি আমাদের বাড়িতে আস না যাও না, সাধারণ খোঁজ খবরও নাও না, হঠাৎ আত্মীয়তা দেখিয়ে গায়ে পড়ে রিক্‌শায় তুলে নিয়ে কানে বিষ ঢালার কী ছিল! নিজের চরকায় তেল না দিয়ে অন্যের চরকায় তেল দেওয়া কেন? কেচ্ছা কেলেঙ্কারী তোমাদের বাড়িতে কম? তোমার এক ভাশুরের ছেলেকে না জেল খাটতে হয়েছে? তোমার ওই ছায়া না মায়া বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল না? বিয়ে তো দিয়েছ এক রাস্কেলের সঙ্গে। তুমি নিজেই বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে কত কীর্তিই করেছ।

সুশীতল গলি ধরে হাঁটতে লাগল। কমলাকে নিয়ে সে এবার কিন্তু সমস্যাতেই পড়বে। পিসীমা আজ আছে কাল থাকবে না। বলা যায়

না কিছুই। সুশীতল লক্ষ করেছে, পিসীমা যেন মনে মনে তৈরী। হয়ত মানুষ বুড়ো হয়ে যাবার পর এক সময় নিজের শেষ বুঝতে পারে। বুঝতে পারলে তার মায়া কী কমে যায়। পিসীমা ছাড়া সুশীতলের কেউ নেই, সুশীতল ছাড়া পিসীমার কেউ ছিল না, নেই। কী মায়া আর সতর্কতা ছিল পিসীমার সুশীতলের ওপর। পিসীমার গায়ের জামা খুললে বোধ হয় সুশীতলের মাথার দাগ দেখা যাবে, সেই বাল্য কৈশোর থেকে ওই জায়গায় একমাত্র সুশীতলেরই মুখ মাথা রাখার জায়গা ছিল। অথচ সেই পিসীমা এখন কেমন নিরুত্তাপ হয়ে গেছে। না, নিরুত্তাপ নয়, কিছুটা যেন উদাসীন। সুশীতলকে রেখে দিয়ে চলে যেতে হবে বলেই কি মায়া কমাচ্ছে? কে জানে?

পিসীমা না থাকলে কমলাকেও কি রাখা যাবে? মানে রাখা উচিত হবে? নিজেও কি থাকবে? এমনিতেই তো কমলা আজকাল মাঝে মাঝেই বলছে, সে অন্য কোথাও চলে যাবে।

ছয়

কেশব কলকাতায় ফিরে এসেছিল কালীপুজো নাগাদ ; তার পরও মাস খানেক কেটে গেল। কলকাতায় তত দিনে নতুন শীত এসেছে, সকালের দিকে তরতর করে বেলা বেড়ে কখন যে দুপুর এসে যায়, দুপুর ফুরোতেই বিকেল, তারপর ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যায় সুশীতল বুঝতে পারে না। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরার সময় ধুলো আর ধোঁয়া ভরা কলকাতাকে চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে সে বুঝতে পারে শীত এসে গেল।

শীত এসে গেলেও সুশীতল যে তিমিরে ছিল প্রায় সেই তিমিরেই রয়েছে। জীবনের সঙ্গে তার শেষ পর্যন্ত বনল না। মানে কেশব যা বলল, তাতে সুশীতল ঘাবড়ে গেল, দেখল জীবনের সঙ্গে ব্যবসায় নামার মতন চাতুর্য তার নেই। জীবন অত্যন্ত চতুর, সে যেভাবে চারপাশ সামলে এগিয়ে আসতে চেয়েছে তাতে সন্দেহ হয় সুশীতলকে খাড়া করে এবং ব্যবসার ছুতো দেখিয়ে বেশ কিছু টাকাপত্র সে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টেনে নিতে চায়। কেশব সুশীতলকে সাবধান করে দিল ; বলল, 'খবরদার, তোকে শালা ফাঁসিয়ে দেবে জীবন।'

সুশীতল সাহস করতে পারল না। জীবনকে অন্য কৈফিয়ত দিয়ে পাশ কাটাল। জীবন খুবই চটল, গরম গরম কথা বলল, তারপর চলে গেল। কাজেই সুশীতল যেমন ছিল সেই রকমই থেকে গেল। লাভের মধ্যে কল্যাণের সুপারিশে আরও কিছু কাজ পেয়ে গেল সেলস্-এর। এটা নানাদিক দিয়েই সুবিধেজনক। অবশ্য ঘোরাঘুরি দৌড়াদৌড়ি বেড়ে গেল। তা যাক্, উপায় কি! পেট চালাতে হবে বইকি।

এক একটা দিন হঠাৎ কেমন ভাল হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখ, সেই একই রকম রোদ, আলো আকাশ; সেই কলকাতার বাদুড়ঝোলা বাস-ট্রাম, ধুলোয় ধুলোয় নিঃশ্বাস আটকে আসার অবস্থা, অথচ এরই মধ্যে ঝপ করে কোথা থেকে কি যেন খসে পড়ে যায়। চমকে না উঠে উপায় নেই।

সুশীতল মাঝ দুপুরে গিয়েছিল একটা অচেনা জায়গায় তার সওদা ফেরি করতে। আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। দুম করে বড় একটা অর্ডার পেয়ে গেল। বেশ কয়েক হাজার টাকার। মনটা তখন থেকেই বেশ খুশী খুশী।

বিকেলে ফোন করল কল্যাণকে, বলল কথাটা।

কল্যাণ বলল, 'সাবাস। তোর ভাল কমিশন থাকবে রে।'

সুশীতল হাসল। কল্যাণের সুপারিশ করা ফার্মের এমন ভাল অর্ডারটার জন্যে ওর নিজেরও খুশী হবার কথা।

'তুই কাল পরশু নাগাদ একবার আয়', কল্যাণ বলল, 'কথা বলব। এইবার তোর বরাত খুলবে।'

সুশীতল হালকা গলায় হাসল।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরল সুশীতল।

পিসীমা ঘরে। জপতপ শেষ করে নিজের বিছানায় বসে আছে, কমলা রান্নাঘরের দিকে।

প্যান্ট জামা ছেড়ে সুশীতল পাজামা পরল, গায়ে গেঞ্জিও। বাথরুম থেকে ফিরে একটা চাদর জড়িয়ে নিল। শীত শীত লাগছে। ডিসেম্বর এসে গেল। শীত পড়ার কথা।

পিসীমার ঘরে গেল সুশীতল।

'তোমার ওষুধের একটা পাওয়া যায় তো আর একটা পাওয়া যায় না', সুশীতল পিসীমার পাশে বসল। 'একটা পেলাম।'

পিসীমার কোন গা নেই ওষুধের কথায়। 'এত ওষুধ গিলিয়ে কি করবি আমাকে ?'

'বাঁচিয়ে রাখব', সুশীতল হাসল। হেসে পিসীমার ঘাড়ের কাছে মুখ রাখল একটু। এ তার বরাবরের অভ্যেস।

'ক'মাস ধরে রোজ ওষুধ গিলছি। পারে মানুষে ?'

'পারে। কত লোক বছরের পর বছর ওষুধ গিলছে।'

'আমি আর পারি না।'

'বা, তুমি ওষুধ না খেয়ে মরবে নাকি !'

'আর বেঁচেই বা কি করব ?'

সুশীতল পিসীমার ঘাড় থেকে মুখ সরিয়ে নিল। 'তোমার কত বয়েস হল ?'

'তুই বল।'

'পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে।'

'তবে ?'

'আরও দশ বছর বাঁচতে হবে' সুশীতল হাসল। 'দাঁড়াও, আমি বিয়ে করি, নাতি-পুতি দেখ, তারপর মরবে-টরবে। এখন নয়।'

পিসীমাও হাসল। অথচ হাসিটা কেমন যেন বিষণ্ণ। 'আমি বেঁচে থাকতে তুই আর কোথায় বিয়ে করলি ! করলে তো দেখেই যেতাম।'

'করব। তুমি বেঁচে না থাকলে আমার কচু রইল কি ?'

পিসীমা ভাইপোর মুখ দেখল। ছানি-কাটানো একটা চোখ প্রায় অন্ধ। কতটুকু দেখল কে জানে !

কমলা ডাকছিল। সুশীতল উঠে পড়ল। চা দিয়েছে কমলা।

নিজের ঘরে এসে সুশীতল দেখল চা জলখাবার রেখে দাঁড়িয়ে আছে কমলা।

খিদে পেয়েছিল সুশীতলের। দুপুরে কয়েকবার চা ছাড়া কিছু খাওয়া হয় নি। মানে খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'তুমি চা খাবে না ?' সুশীতল বলল

'খাব।'

'নিয়ে এস। আজ বেশ শীত শীত করছে।'

কমলা চলে গেল।

সুশীতল একটা ব্যাপারে কমলার কাছে কৃতজ্ঞ। কমলা রাগী, জেদী, রুক্ষ যা-ই হোক না কেন এই বাড়িটা সত্যি সত্যিই সে সামলে রেখেছে।

অন্তত স্বীকার করতেই হবে, পিসীমার ছানি কাটানোর পর থেকে নানা উৎপাত এ-বাড়িতে লেগেই আছে, কমলা যদি না সে উৎপাত সামলাত সুশীতলকে বিপদে পড়তে হত। পিসীমার বুকের অসুখটার পর কমলাকে যত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে এতটা বোধহয় আগে হয় নি।

সামান্য পরেই কমলা ফিরে এল।

আজকের ব্যাপারটা বলার জন্যে মন উসখুস করছিল সুশীতলের। কত কাল যেন ভাল কোন খবর ছিল না। রোজই হয় হতাশা ব্যর্থতা, না হয় একঘেয়েমির বিরক্তি; একই রকম কায়কষ্টে বেঁচে থাকার খবর। আজ হঠাৎ সব পাল্‌টে গেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু পাওয়া গেছে। মন-টন ভাল, খুশী খুশী লাগছিল।

সুশীতল বলল, 'আজ একটু বরাত ফিরেছে', হালকা করেই বলল, 'এক জায়গায় গিয়েছিলাম, কিছু কাজকর্ম যোগাড় হয়ে গেছে, ভাল টাকার। হাজার আষ্টেক টাকার অর্ডার।'

কমলা বসল। তার হাতে চায়ের কাপ।

সুশীতল জল খেয়ে চায়ের কাপ তুলে নিল।

'পিসীমার একটা ওষুধ পেয়েছি আর একটা পাই নি। কাল আনব যোগাড় করে।' বলে সুশীতল হাত দিয়ে টেবিলের দিকে দেখাল।

কমলা আড়চোখে টেবিলের দিকটা দেখে নিল। পিসীমার ওষুধ-বিষুধ, খাওয়া-শোওয়ার কথা সুশীতলের চেয়ে সে বেশী জানে, তাকে জানতে হয়।

সুশীতল হালকা মেজাজে ছিল। বলল, 'পিসীমাকে আমি বলেছি এখনও দশ বছর বাঁচিয়ে রাখব।' বলে হাসল সুশীতল। 'বুড়ী বিশ্বাসই করে না।'

কমলা অল্প চুপ করে থেকে বলল, 'রাখাই তো উচিত।'

'তা ঠিক। তবে মানুষের মরা বাঁচা আমাদের হাতে নেই,' সুশীতল কেমন অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাল, কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ; তারপর আবার কমলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হার্টটা গোলমাল হয়ে গেল পিসীমার। বড় ভয় করে।'

কমলা তার চা খেল। কোন রকম শব্দ হল না।

'অবশ্য পিসীমাকে দশ বছর বাঁচিয়ে রাখতে হলে তোমার ওপর অত্যাচার করা হবে,' সুশীতল যেন আবার হালকা হয়ে যাবার চেষ্টা করল। হাসল মৃদু, 'তোমায় ধরে রাখতে হবে দশ বছর। ইন্ ফ্যাক্ট, তুমিই পিসীমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ।'

কমলা হাসল না। বলল, 'পিসীমাকে বাঁচানোর কথা বাদ দাও। তুমি নিজে বাঁচার কি করছ?'

'আমি? কেন?' সুশীতল কমলার চোখে তাকাল।

'বাড়ির একটা ব্যবস্থা কর…!'

'ব্যবস্থা! মানে এই…?' সুশীতল হাত নাড়ল, নেড়ে সংসারের কথা-টথা বোঝাতে চাইল বোধ হয়।

'এই শীতটুকু; তারপর আমি কিন্তু সত্যিই থাকব না।'

সুশীতল অবাক হল না। পুজোর সময় থেকেই কমলা চলে যাবার ঝোঁক ধরেছে। পুজোর সময় যাব যাব করেও যায় নি, বা যেতে পারে নি। কমলার কথায় প্রথমটায় তেমন কান করে নি সুশীতল, ভেবেছিল কমলা কোন কারণে অসন্তুষ্ট, কিংবা সে রাগ করে চলে যেতে চাইছে। পরে আরও কয়েকবার ওই প্রসঙ্গ ওঠার পর তার ধারণা জন্মেছে কমলা সত্যিই চলে যেতে চাইছে। কোথায় যাবে? কার কাছে, তা অবশ্য কমলা বলে না। সুশীতলও বুঝতে পারে না কোথায় যাবে কমলা।

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল সুশীতল। কথা বলল না।

কমলাও নীরব। সুশীতল সিগারেট ধরাল। কমলা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে আছে।

নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল সুশীতল। 'তুমি কি সত্যি সত্যি আশ্রম-টাশ্রম খুঁজছ নাকি?'

কমলা তাকাল। সুশীতলের চোখের এই নির্বোধ দৃষ্টি তার ভাল লাগে না। কখনও কখনও রাগ হয় প্রচণ্ড, ঘৃণাও। কমলা বলল, 'তোমায় কতবার একই কথা বলতে হবে?'

'না,' সুশীতল ইতস্তত করল, থামল একটু, যেন ভাবল কি বলবে, তারপর বলল, 'তুমি বল, আমি শুনে যাই। ব্যাপারটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না।'

'কেন?'

'কোথায় যাবে তুমি?'

'আমার ব্যবস্থা আমি করেছি।'

সুশীতল চুপ। ভাবছিল। বার দুই সিগারেট টানল, ধোঁয়া গিলে নিল পুরোটাই। কমলার মুখ তার কখনও খারাপ লাগে না দেখতে, নাকের ডগাটি সামান্য মোটা এবং তেলতেলে, কোথায় যেন এমন কিছু আছে যাতে কমলার ওই নাকের ডগা কেমন যেন অস্বস্তি এনে দেয় সুশীতলকে। সুশীতল বলল, 'তুমি চলে গেলে পিসীমাকে নিয়ে আমি ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাব।'

'সে তো আগেই বলেছ।'

'বলেছি। আমি কি করতে পারি বল।...একটা লোক-টোক রাখা যায়। কিন্তু তেমন কাকে পাব? আমি সারাদিন বাড়িতেই থাকি না। পিসীমাকে দেখবে, বাড়ি সামলাবে...এ রকম বিশ্বস্ত কোন মেয়েলোক পাওয়া মুশকিল।'

কমলা সুশীতলকে দেখতে দেখতে সামান্য বাঁকা করে হাসল। 'তোমার বাড়িঘর পিসীমাকে দেখাশোনার জন্য একজন বিশ্বস্ত মেয়েলোক দরকার। এই তো?'

'হ্যাঁ, আর কি—' সুশীতল সাদামাটা ভাবে বলল।

কমলা একপাশের গাল কুঁচকে বিদ্রূপের গলায় বলল, 'এতে আর অসুবিধে কি?'

'কেন?'

কমলার ঠোঁট কুঁচকে গেল। বলল, 'বিয়ে করে ফেল।'

'বিয়ে?'

'খানিকটা আগে পিসীমাকে বলছিলে না?'

সুশীতল হাসির মুখ করল। 'বলছিলাম। পিসীমাকে বলছিলাম, আরও দশটা বছর বেঁচে থাকতে হবে...'

'তুমি একটা বিয়ে করে ফেল; কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না।'

'বাড়তেও পারে ঝঞ্ঝাট,' সুশীতল বলল, 'চাকরি-বাকরি নেই, বাপের টাকা পয়সা থাকলেও না হয় হত, কিন্তু আমার মত অপদার্থকে কে মেয়ে দেবে।'

কমলা স্থির চোখে সুশীতলের মুখ দেখতে দেখতে বলল, 'কেন, তোমার চেহারাটি তো ভালই।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না। চেহারা দেখলে নরম-সরম ভদ্র, ভাল ছেলে বলেই মনে হয়,' কমলা চোখ কুঁচকে হাসল একটু, 'আর যদি কাজকর্মের কথা বল, তোমার মতন পুরুষ মানুষ কত কাল আর বসে থাকবে। এখনই কেমন কাজকর্ম পেতে শুরু করেছ!'

সিগারেট শেষ হয়েছিল সুশীতলের, নিবিয়ে দিল। বলল, 'আমার বিয়ের কথা থাক। তোমার কথা বল।'

'কী বলব?'

'তুমি কি সত্যি সত্যি চলে যাবে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

কমলা চোখ বড় করে দেখল সুশীতলকে, 'এখানে ভাল লাগছে না।'

'এখানে মানে এই বাড়ি? নাকি আমি? না পিসীমাকে দেখাশোনা করতে তোমার ভাল লাগছে না?'

কমলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সামান্য পরে বলল, 'পিসীমার জন্যেই এ-বাড়িতে জায়গা পেয়েছিলাম, ওঁকে খারাপ লাগছে বললে আমার পাপ হবে; তোমরা অকৃতজ্ঞ ভাববে। পিসীমার জন্যে আমার যা করার করেছি। এবার তুমি কর।'

'তুমি তাহলে বিরক্ত হয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছ?'

কমলা গায়ের আঁচল গোছাল। 'হ্যাঁ তাই।'

'তাহলে আমি বুঝব, আমার উপরই তোমার রাগ।'

কমলা স্পষ্ট অথচ বিরক্তির চোখে সুশীতলের দিকে তাকাল। 'তুমি কচি খোকা নও।'

'না', মাথা নাড়ল সুশীতল, 'আমি খোকা নই। কিন্তু আমার ওপর তোমার এই রাগেরও কোন মানে হয় না। যাক্ গে, কথা বাড়ালেই বাড়বে। আমি কিছু বলব না। তোমার যেতে ইচ্ছে হয় যেও, থাকতে ইচ্ছে হয় থেকো। সব মানুষেরই কোন না কোন ভাবে চলে যায়।'

কমলা কোন কথা বলব না।

সুশীতলও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আচমকা বলল, 'তুমি আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছ। আমারও ভাল লাগে না।'

কমলা শুনল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমারও নয়।'

সাত

একেই বোধ হয় ভাগ্য বলে। যখন চাকরি ছেড়ে সুশীতল মনে করেছিল, তার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আজ বা কাল কিংবা পরশু সে একটা চাকরি নিশ্চয় পেয়ে যাবে তখন দেখা গেল তার এই আত্ম-বিশ্বাস কোন কাজে দিল না। আজকালকার দিনে চাকরি হাতের মোয়া নয়। বোধ হয় কোন কালেই ছিল না। সুশীতল হন্যে হয়ে ঘুরে চাকরি পেল না। বিরক্ত হয়ে, হতাশ হয়ে সুশীতল ভেবেছিল ছোটখাট ব্যবসায় নামবে। চেষ্টাও করেছিল। হল না। তারপর কোন কিছু না পেয়ে কিছু রোজগারের আশায় মেশিন টুল্‌স বিক্রী-বাটার দালালী নিয়ে পড়ল। এটা লেগে গেল। সে তেমন দালালী একটা বোলচাল দেবার মতন ছেলে নয়, খুব একটা সপ্রতিভও নয়, যন্ত্রপাতির ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝলেও ও ব্যাপারে দক্ষ নয়, তবু তার কপালে সে এখানে চলে গেল। তারপর এলো অন্য কোম্পানীতে। তারা সুশীতলকে কাজে লাগিয়ে দেখল ভাল কাজ দিয়েছে ছোকরা। এর পরই আচমকা প্রায় আকাশ ফুঁড়ে সুশীতলের জন্য একটা চাকরি নেমে এল। অবাঙালী ফার্ম ; বেহালার দিকে মস্ত কারখানা, রেলের ছোটখাট খুচরো যন্ত্রপাতি তৈরি করে ; সুশীতলকে সরাসরি চাকরি দিয়ে দিল। যোগাযোগটা ঘটেছিল আচমকা। ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসে।

সুশীতলের মনে হল, বার্ড কোম্পানীর চাকরি ছাড়ার পর সে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোথাও তার চাহিদা মতন চাকরি পায় নি। নিজের আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতা সম্পর্কে তার তখনই সন্দেহ

হল। সুশীতলকে কেউ পোঁছে না, কেউ নয়। রীতিমত হতাশ ও লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সুশীতল। এত দিন পরে, এ-ঘাট সে-ঘাট ঘুরে হঠাৎ যখন আবার একটা চাকরি পেল সুশীতল এবং মামুলি চাকরি নয়, ভাল চাকরি, মাইনে-পত্রও ভাল তখন নিজের যোগ্যতার উপর আবার আস্থা ফিরে পেল সে। বোধ হয় নিজের অহংকারও অনুভব করতে পারল নতুন করে।

কেশব বলল, 'চাকরিটা নিয়ে নে।'

সুশীতল বেশ খুশী। বলল, 'সিওর। এগারোশো টাকা মাইনে! প্লাস কিছু অ্যালাওএন্স।'

'তুই বেটা বড়লোক হয়ে যাবি।'

'বলতে…! টাকা ধার চাস।'

'এখনই কিছু ছাড়। চল, একটু মাল খেয়ে আসি।'

কেশব মদ্য-টদ্য খায় না। নেহাত বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়লে এক আধ দিন অল্পস্বল্প খেয়ে ফেলে।

সুশীতল বলল, 'কল্যাণের কাছে চল। আসলে ও বেটার রেফারেন্স ছিল। শালাকে ছুটো সন্দেশ খাইয়ে আসি।'

হাসি তামাশা করতে করতে ছুজনে কল্যাণের অফিসে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ হইহই করে বেরিয়ে পড়ল তিনজনেই।

রাস্তায় নেমে কেশব আবার বলল, 'সুশীতল, তুই শালা টাকা ছাড়, সেলিব্রেট করব। ছাপ্পর ফুঁড়ে চাকরি। ইলেভেন হান্‌ড্রেড্‌. …ভাবতেই পারছি না।'

সুশীতল চোখ টিপে বলল, 'চল।'

বাড়ি ফিরতে রাতই হয়ে গেল সুশীতলের, নেশার অভ্যাস তার নেই। জীবনে ছু' চারবার হয়তো বন্ধুবান্ধবদের টানাটানিতে বার-য়ে গিয়েছে। ঠোঁটে স্পর্শ করেছে বড় জোর, কিংবা এতই সামান্য খেয়েছে যে রাস্তায় নেমে অনুভব করে নি।

আজ একটু অন্য রকম হয়ে গেল। হত না, যদি না কেশব তাকে উত্তেজিত করে দিত। কেমন একটা উত্তেজনার মাথায় সুশীতল তার সহ্যের অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছিল।

নেশা নিয়েই সুশীতল বাড়ি ফিরল। পিসীমা শুয়ে পড়েছে। কমলা জেগে ছিল।

সুশীতল বাড়ি ঢোকার আগে ভেবেছিল, সে কোন রকম ঝঞ্ঝাট ঝামেলা না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। কমলাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

বাড়ি ফিরে অন্য রকম হয়ে গেল।

জামা-টামা ছেড়ে বাথরুমে যাবার সময় সুশীতল দেখল, কমলা আলো জ্বেলে খাবার জায়গা গোছগাছ করছে।

সুশীতল বলল, 'আমি খাব না। তুমি খেয়ে নাও।'

কমলা তাকাল না।

বাথরুম থেকে ফিরে আসার সময়ও সুশীতলের নজরে পড়ল কমলা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘরে ফিরে সুশীতল ঠাণ্ডা মুখ-টুখ মুছল। কলকাতায় এখন শীত চলছে। সুশীতল তেমন শীত অনুভব করছিল না।

অপেক্ষা করে কমলাই ঘরে এল। 'কী হল?'

তাকাল সুশীতল কমলার দিকে। 'খাব না বললাম যে।'

'না খাবে তো আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখার মানে?'

সুশীতল একটা কৈফিয়ত খোঁজবার চেষ্টা করল। বলল, 'আমি খেয়ে এসেছি। তুমি খেয়ে নাও।'

'খেয়ে এসেছ?'

মাথা নাড়ল সুশীতল। 'কেশবের সঙ্গে একটা নেমন্তন্ন…'

কমলা আর কিছু বলল না। চলে গেল।

সুশীতল শোবার জন্যে তৈরি। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। জল তেষ্টা পাচ্ছিল। ঘরে কোথাও জল নেই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেলে কমলা গ্লাসে করে জল রেখে যায়। আজ হয়তো

বেশীই তেষ্টা পাবে, শরীরে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না সুশীতল। চোখের চারিদিকে, কপাল-টপাল কেমন অবশ লাগছে, মানে ঘুমের মতন, নেশা-টেশা তার পোষায় না, অভ্যাস নেই। এখনও গলার কাছে ঢেঁকুর, মাংসের কী একটা খেয়েছিল, সেই মাংসের মশলার, পিঁয়াজের, সেঁকা পাঁপরের আর হুইস্কির মেলানো একটা ঝাঁঝ যেন বুকের তলা থেকে গলা পর্যন্ত উঠে আসছে মাঝে মাঝেই।

জলের জন্যে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুশীতল।

বাইরে এসে সুশীতল খাবার জায়গার দিকে যাচ্ছিল, দেখল, কমলা রান্নাঘর বন্ধ করে খাবার জায়গা পরিষ্কার করে ফেলেছে।

'জল দাও' সুশীতল কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

কমলা গ্লাসে জল ভরে এগিয়ে দিল।

জল খেয়ে সুশীতল যেন খেয়াল করে খাবার টেবিলটার দিকে তাকাল। একেবারে সাফসুফ। কমলা খায় নি। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া সারা তার পক্ষে অসম্ভব।

'তুমি খাও নি?'

'না।'

'সে কি! কেন?'

'ইচ্ছে হল না।'

সুশীতল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অপরাধী মনে করল নিজেকে। রাত্রে কোন দিনই কমলা আগে খেয়ে নেয় না, সুশীতলের জন্যে অপেক্ষা করে। একই সঙ্গে দুজনে খেতে বসে। দুজনের মধ্যে নেহাতই যখন বড় রকম ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়, সুশীতলকে একা একাই খাওয়া সারতে হলেও কমলা কাছে থাকে, সুশীতল উঠে গেলে কমলা খেতে বসে।

সুশীতল বলল, 'আজ একটা ব্যাপার হয়ে গেছে', বলে কমলার দিকে তাকাল, চোখের পাতা কেমন জুড়ে আসছিল তার। 'একটা ভাল খবর পেলাম। আমি একটা চাকরি পেয়েছি। একেবারে হঠাৎ। এগারোশো টাকা মত মাইনে। কেশব খুব খুশি হয়ে

বলল, চল খাওয়া। আমরা দুজনে খেতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আর একজন বন্ধু ছিল।'

কমলা হাতের বাকি কাজ সারতে সারতে সব শুনছিল। কোন জবাব দিল না। সুশীতল যেন কোন জবাব আশা করছিল। অপেক্ষা করতে লাগল।

জবাব না দিয়ে কমলা আরও এক গ্লাস জল গড়াল। জল গড়িয়ে সুশীতলের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল, 'বাতিটা নিবিয়ে দাও।'

কমলা সুশীতলের ঘরে এসে জল রেখে দু-চার মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে, সুশীতল ঘরে এলো।

'তুমি এত চটাচটি করছে কেন?' সুশীতল বলল, 'একদিন বাইরে খেলে…'

'সরো, যাই।'

'না, মানে—তুমি এত চটে যাচ্ছ কেন? চটবার কী আছে? হঠাৎ একটা ভাল খবর হয়ে গেল; শখ করে একদিন তাই একটু খেয়ে ফেললাম।'

'বেশ করেছ।'

'তুমি আমায় মাতাল ভাবছ?'

'না।'

'তবে? গন্ধ পাচ্ছ?'

'পেলেই বা—'

সুশীতল সরে বিছানার দিকে চলে গেল। 'আমি একটা ভাল চাকরি পেয়েছি, কিছু বলছ না?'

'ভালই হয়েছে।'

'পিসীমাকে কাল সকালেই বলব।'

কমলা আর কোন কথা বলল না, ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুশীতল সামান্য বসে থাকল। উঠে পড়ল আবার। দরজা বন্ধ করার সময় মনে হল, কমলা তার ঘরে চলে গেছে। বাইরে কোথাও বাতি জ্বলছে না। কমলার ঘরের দরজাও হয়তো বন্ধ।

আলো নিবিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে এল সুশীতল। তারপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ার পর তার হঠাৎ জবার কথা মনে পড়ল। কেশব বলছিল, প্রীতিবউদি এখন নাকি জবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। ভবানীপুরের দিকে কোন্ একটি ছেলেকে তাঁদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। কথাবার্তা চলছে।

সুশীতল আপন মনেই আফসোসের মতন করে শব্দ করল জিভে। ঠাট্টা করল নিজেকেই, জবাকে আর ধরা যাবে না, কোন আশা নেই। তারপর সান্ত্বনা দিল নিজেকেই : তুমি কোনদিনই জবাকে ধরবার চেষ্টা কর নি হে সুশীতল, কাজেই আফসোস বৃথা।

ঘুম আসছিল সুশীতলের, হঠাৎ গলির মধ্যে দুদ্দাড় ছোটাছুটির শব্দ উঠল। শীতের দিন, জানালা বন্ধ, তবু ছোটাছুটির শব্দ এবং তারপরই চেঁচামেচি। ব্যাপারটা কী ঘটেছে বোঝবার আগেই যে ধরনের বোমা ফাটল তাতে সুশীতল চমকে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে নিশ্চিন্ত হল। এ-পাড়ায় এটা নতুন কিছু নয়, মাঝে মাঝেই দু' দল ছেলের মধ্যে কুরুক্ষেত্র হয়, দিনে দুপুরে এবং রাতেও। রাতেই বেশী। বোধ হয় রাতের যুদ্ধটাই জমে। রাস্তার আলো-টালো নিবিয়ে দু' পক্ষই বোমা, পটকা, বোতল-টোতল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে যায়।

কী কারণে এই যুদ্ধ তা অবশ্য সুশীতল জানে না। এক সময় রাজনীতির নাম করে হত ; এখন রাজনীতি নেই ; এখন বোধ হয় পুজো আচ্চা, অমুক-তমুক নিয়ে হয়। দিন দুই রেষারেষি চলে তারপর আবার শান্ত হয়ে পড়ে।

গলির মধ্যে যে ধরনের হুঙ্কার, হইহই, পটকাবাজি চলছিল তাতে ঘুমোবার কথা ওঠে না। সুশীতল উঠল। জানলা খুলে নীচের দিকে তাকাল। অন্ধকারে কাউকে চেনা যায় না। বড় ইতর ভাষায় কেউ একজন গালিগালাজ করছে। আশেপাশের বাড়ির কোন কোন জানলা খুলে নীচের ঘটনাটা কেউ কেউ দেখছিল। আবার জানলা বন্ধ করে দিচ্ছিল।

সুশীতল বুঝতে পারছিল না, পাড়ার মধ্যে এই ইতর অশ্লীল গালিগালাজ কেমন করে করতে পারে পাড়ারই ছেলেগুলো? আর পাড়ার লোকই বা কেমন করে এসব সহ্য করে? সুশীতল নিজে ছাত্রজীবনে কিছুদিন মিছিল-টিছিলে মেতে উঠেছিল। তারপর সরে এসেছে। একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত, তাদের সময়ে এই ধরনের নোঙরামি ঘটত না।

জানলা বন্ধ করে দিল সুশীতল। আবার জল তেষ্টা পাচ্ছে। একবার বাথরুমেও যেতে হবে।

ঘরের আলো জ্বালল সুশীতল। বাইরে গেল।

বাথরুম থেকে ফেরার সময় দেখল, পিসীমার ঘরের কাছে কমলা দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়াল সুশীতল। কমলা নিজের ঘরে চলে আসছিল।

সুশীতল বলল, 'কী ব্যাপার?'

কমলা ফিরে তাকাল। 'কিসের?'

'পিসীমার কী হল?'

'কিছু নয়।'

'তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

'দেখছিলাম, জেগে উঠেছেন কিনা?'

'জেগে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

কমলা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুশীতল এগিয়ে গেল। 'আজ গণ্ডগোলটা কিসের?'

ঘরে ঢুকে পড়েছিল কমলা। ঘুরে দাঁড়াল। 'জিজ্ঞেস করে এসো।'

মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিতে পারে কমলা, সুশীতল হাত বাড়াল, এগিয়ে এল আরও দু' পা। 'তুমি এই গোলমালের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে নাকি?'

'কেন?'

'পাড়াটা বড় বিশ্রী হয়ে উঠছে দিন দিন। ভদ্র পাড়া বলে আর মনে হয় না।'

কমলা কোন জবাব দিল না। সুশীতল কমলার ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। আলো জ্বলছে না। জানলা বন্ধই রয়েছে।

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' সুশীতল জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'আমার ঘুম এসেছিল; গোলমালে ভেঙে গেল।'

'এবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

সুশীতল দু' মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'আমার ওপর তুমি চটে গেছ। ব্যাপারটা এমনিই হয়ে গেল। কেশব বলল। আমি ওসব খাই-টাই না। কেশবও খুব কম। একটু খেয়েই আমার শরীর কেমন আনচান করছিল। যাক্ গে, তুমি কিছু মনে কর না। মাফ করে দিয়ো।'

কমলা অপেক্ষা না করেই বলল, 'থিয়েটার করো না। নিজের ঘরে যাও। তুমি মদ খাও আর গাঁজা খাও, আমার কিছু যায় আসে না। মদ খাওয়া মানুষ আমি দেখেছি, ঘরও করেছি। ওতে আমার গা গুলোয় না।'

সুশীতল কেমন থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সামান্য আগে তার কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। এখন হঠাৎ রাগ হল। একেবারে আচমকাই রাগটা মাথায় চড়ে বসল।

'তোমার গায়ের চামড়া বেশ মোটা তাহলে?' সুশীতল বিদ্রূপ করে বলল।

কমলা এবার একটু অপেক্ষা করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মোটা। পাতলা হলে এ-বাড়িতে থাকব কেন!'

আট
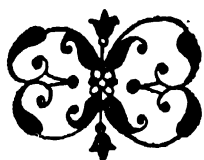
সকালে ঘুম ভাঙতে বেলা হল অনেকটা। ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসতেই সুশীতল আলো এবং রোদ দেখে বুঝতে পারল, দেদার ঘুমিয়েছে আজ। এ-রকম বেলা সচরাচর তার হয় না। যদি বা সে ঘুমোয়, কিংবা আলস্য নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে কমলা তাকে জাগিয়ে দেয়। বাইরের দরজায় বার বার ধাক্কা মেরে, ডেকে ডেকে উঠিয়ে দেয় ঠিক। না দিয়ে উপায় নেই, আটটার মধ্যে কমলাকে তার স্কুলে চলে যেতে হয়, ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা।

কমলা আজ তাকে ডাকে নি। ডাকলে সুশীতল নিশ্চয় জেগে উঠত।

মুখ-টুখ ধুয়ে আসতে সুশীতল বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে গায়ে চাদর-টাদর জড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল চায়ের।

চা আসছে না দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল সুশীতল, বাইরে এল। পিসীমার সঙ্গে মুখোমুখি। 'চা-টা কোথায়?'

পিসীমার গায়ে মোটা চাদর। মাথা ভরতি পাকা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। চোখে চশমা। একটু কুঁজো হয়ে আছে শীতে।

'গোপাল তো চা তৈরি করছিল। ও গোপালী…।'

রান্নাঘরের দিক থেকে গোপালীর সাড়া পাওয়া গেল। ঠিকে-ঝি হিসেবেই বহাল হয়েছিল কাজে। এখন সকালের দিকটা সবই প্রায় করতে হয়। কমলা চায়ের পাট শেষ করে, বাজার-টাজার আনিয়ে চলে যায় স্কুলে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত গোপালীই সব।

'গোপালী এখনও বাজারে যেতে পারে নি', পিসীমা বলল।

'কেন ?'

'কমলা কখন চলে গেছে !'

'চলে গেছে ?' সুশীতল অবাক হয়ে পিসীমার দিকে তাকাল।

'সকাল সকাল স্কুলে চলে গেছে। আমাকেও ডাকে নি। গোপালী কাজে এসেও দেখে নি কমলাকে।'

সুশীতল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বাড়িতে কাউকে না জাগিয়ে, না ডেকে, চা-টা না খাইয়ে কমলা স্কুলে চলে যায় না। ভোর ভোর তার স্কুলে যাবারই বা কি হয়েছে ! রাগ ! কাল রাত্রের জের চলছে নাকি ?

গোপালী চা এনে দিল।

বারান্দায় অল্প রোদ ছিল। সুশীতল রোদে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে পিসীমাকে বলল, 'কাউকে কিছু না জানিয়ে সকালে স্কুলে চলে গেছে কমলা ?'

'তাই দেখছি।'

'তুমি কখন উঠেছ ?'

'গোপালী আসার পর।'

সুশীতল কালকের রাত্রের কথা ভাবল। মনে পড়ল সবই, কিন্তু ঝাপসা হয়ে এসেছে যেন এই সকালেই। বাড়ি ফিরে এসে সুশীতল এমন কিছু করে নি যাতে কমলা খেপে যেতে পারে। সে রাত্রে খায় নি, সুশীতলের মনে পড়ল। মনে পড়ল, রাত্রে গলিতে গোলমাল হচ্ছিল। কমলার সঙ্গে তখন কথাও হয়েছে। সুশীতল মাফ চেয়েছিল। কমলা যেন কি বলেছিল তাকে।

'গোপালীকে এবার বাজারে পাঠাই, অনেক বেলা হয়ে গেছে,' পিসীমা বলল।

'পাঠাও।'

'টাকাপয়সা দিবি ?'

সুশীতল তাকাল পিসীমার দিকে। পিসীমার হাতে যখন সংসার ছিল তখন নিজেই পাঠিয়ে দিত পিসীমা হাটবাজার করতে।

সুশীতলকেও পাঠাত। কমলা এসে সংসারের দায় নেবার পর সবই সে দেখাশোনা করত। এই ভাবে সকাল বেলা সুশীতলের কাছে বাজারের টাকা পয়সা কেউ চাইত না। আগেভাগেই নেওয়া থাকত খরচ-টরচ।

'দিচ্ছি।'

চা খেতে খেতে ঘরে গেল সুশীতল। তারপর টাকা এনে পিসীমার হাতে দিল।

গোপালী বাজার চলে যাবার পর সুশীতল পিসীমাকে চাকরির কথা বলল। পিসীমা যেন আহ্লাদে গলে গেল। সারাটা দিন সুশীতল এই যে হুড়োহুড়ি করে বেড়ায়, এখানে ওখানে ছোটে, টাকা টাকা করে ছটফট করে, এ সব ভাল লাগছিল না পিসীমার। এই করে ছেলেটা মরবে। তোর বাপ ঠাকুরদা কোনদিন ব্যবসাপত্তর করল না, তুই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে কেন যাস বাবা। চাকরিই তোকে পোষায়।

ভাইপোর গালে কপালে চুমু খেয়ে পিসীমা একটু হেসে বলল. 'যাক, এতদিনে তোর মাথার পোকা মরেছে। বেশ হয়েছে। চাকরিতে ঢুকবি কবে?'

'এই তো, দিন চারেক পর। সোমবার থেকে।'

'খুব ভাল। এবার মন দিয়ে কাজ-টাজ কর।'

সকালের পূজো সারা হয়ে গিয়েছিল পিসীমার। কমলা নেই, গোপালীও বাজারে গিয়েছে, বুড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। একেবারে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতে চায় না পিসীমা, অন্তত দিনের বেলায় চুপ করে বসিয়ে রাখা যায় না পিসীমাকে।

সুশীতল ঘরে এসে বসে থাকল একটু। সিগারেট খেল। কমলার আজকের ব্যবহার বড় অদ্ভুত। এ রকম সে কখনো করে না। কাউকে কিছু না জানিয়ে ভোরবেলা স্কুলে চলে যাবে কেন? এমন কি ঘটেছে? সুশীতল কাল একটু নেশা করে বাড়ি এসেছিল, কিন্তু কমলার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার তো করে নি।

ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সঙ্গত কোন কারণ নেই, তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুশীতল। যেন কোন সন্দেহ নিরসনের জন্যে কমলার ঘরে গেল। দরজা ভেজানো ছিল না পুরোপুরি। জানলাও বন্ধ। কমলা জানলা খোলে নি সকালে। সুশীতল জানলা খুলে দিল।

কমলার বিছানা পরিষ্কারও নয়। মাথার বালিশ কোণাকুণি পড়ে আছে। চাদর এলোমেলো। ঘরের মধ্যে একেবারে মামুলি কিছু আসবাবপত্র। কোনটাই কমলার নয়। এ-বাড়ির। পিসীমা এই ঘর কমলাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সময়, কোন কিছুই সরায় নি।

দেওয়াল তাক যেমন থাকত সেই রকমই আছে। ছোট আলনায় কমলার শাড়ি জামা। কোণের দিকে একটা বাক্স আর বেতের ঝুড়ি।

সুশীতল এই ঘর দেখে কিছু বুঝতে পারল না। একটা মানুষ সকাল বেলায় ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ঘরের কোন চেহারা পাল্টায় না। সবই সেই রকম, বিছানা, বাক্স, আলনা, পোশাক-আশাক, দেওয়ালে ঝুলানো আয়নার তলায় ছোট র‍্যাকে পাউডার কৌটোটা পর্যন্ত ঠিকঠাক রাখা রয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুশীতল। কমলা স্কুলেই গিয়েছে। হয়তো কাল খুবই খেপে গিয়েছিল, যার ফলে আজ সকালে ইচ্ছে করেই কাউকে ডাকে নি, জব্দ করবার চেষ্টা আর কি!

কিন্তু কমলা আজকাল, সেদিনও চলে যাবার কথা বলছিল। সত্যিই কি সে চলে গেল? যদি তাই গিয়ে থাকে তবে কাউকে কিছু জানাবে না? না বলে-কয়ে চলে যাবে? এমন কি পিসীমাকেও কিছু বলবে না?

বিশ্বাস হল না সুশীতলের। পিসীমকে না জানিয়ে কমলা চলে যেতে পারে না।

বেলা বাড়তেই লাগল। বেলা বেড়ে যাবার পর রোদ-টোদ বেশ ঝাঁঝালো হয়ে আসে আজকাল। শীত ফুরোবার পর যেমন হয়। সুশীতল রোজকার মতন দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে ফেলল। স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে বেরুবে। কোন তাড়াহুড়ো নেই। বারোটা নাগাদ বেরুতে পারলেই যথেষ্ট। কিছু কাজ পড়ে আছে, দু-এক জায়গায় যেতেও হবে। টাকাপয়সাও পাওনা রয়েছে কুনারীরামের কাছে।

অন্যান্য দিনের মতনই লাগছিল। সুশীতল কোন পার্থক্য বুঝছিল না বাইরে বাইরে, গোপালী রান্নাবান্না করছে, পিসীমা মাঝে মাঝে কথা বলছে গোপালীর সঙ্গে, রোজই এই রকম হয়, কমলা স্কুলে থাকার সময় বাড়িতে গোপালী আর পিসীমাই থাকে, তাদের গলার সাড়াশব্দ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। কমলার স্কুল ছুটি থাকলে অন্য কথা। আজ যা ঘটছে, এটাকে স্বাভাবিক ধরে নিলেও সুশীতল কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কমলা স্কুলে যাবার আগে সকলকে জাগিয়ে চা-টা খাইয়ে, বাজার রান্নার ব্যবস্থা পাকা করে চলে যায়। আজ কমলা কিছুই করে নি। এমন কি, নিজের ঘরের কোন কিছু পরিষ্কার করে নি। ঘর বাসি রেখে চলে গেছে। এ ভাবে কমলা যায় না। রাগের বশেই বিছানা পত্র পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেল, নাকি কাল মাথা গরম করে সারারাত ঘুমোয় নি, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠতে বেলা হয়ে যাওয়ায় তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে? তাই বা কি করে হবে? গোপালী সকালে আসে—গোপালী এসেও কমলাকে দেখে নি।

স্নান-টান শেষ করল সুশীতল। মন খুঁতখুঁত করছে। এগারোটা বেজে গেছে। কমলা যদি স্কুলে গিয়ে থাকে আর আধঘণ্টার মধ্যে তার ফেরার কথা।

কমলার জন্যে অপেক্ষা করার মন নিয়ে গড়িমসি করে খাওয়া দাওয়া শেষ করল সুশীতল। সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। নিজের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াল। সিগারেট খেতে খেতে গলির দিকটা দেখতে লাগল। কমলা কি আসছে?

বারোটাও বেজে গেল। কমলা এল না। সুশীতল কখনও কারও জন্যে এভাবে অপেক্ষা করে নি। এমন একটা উদ্বেগ অশান্তি বিরক্তি নিয়ে।

পিসীমার স্নান আগেই শেষ হয়েছে। ঘরের বারান্দার দিকে ছায়ায় বসে ছিল মোড়ায়। গোপালী নিজের কাজ শেষ করে নীচে গিয়েছে কোথাও।

'পিসীমা ?'

'কমলা এখনও এলো না! ক'টা বাজল রে ?'

'বারোটা বেজে গেছে।'

'এত বেলা করছে—!'

'আমিও তো তাই ভাবছি। আরও আধঘণ্টা আগে আসার কথা।'

'রাস্তায় আটকেছে ?'

'রাস্তায় আটকাবে কেন। হাঁটা পথে স্কুল; দশ বারো মিনিট যেতে লাগে।'

'তাহলে ?'

'কি জানি, স্কুলে যদি কিছু হয়ে থাকে—।'

পিসীমা চুপ করেই থাকল। মুখ দেখলে মনে হয়, দুশ্চিন্তা রয়েছে।

সুশীতল সামান্য চুপ করে থেকে বলল, 'আমি বেরুচ্ছি। স্কুলের দিকটা দেখে যাব। তুমি কমলার জন্যে হাঁ করে বসে থেকো না, খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।'

পিসীমা মাথা হেলিয়ে সুশীতলের দিকে তাকাল। 'কী হয়েছে কমলার ?'

রাগ এবং বিরক্তির গলায় সুশীতল বলল, 'জানি না। তুমি ওকে এত আস্কারা দিয়েছ যে, মাথায় উঠে বসেছে। যত ঝঞ্ঝাট সব তোমার জন্যে।' বলতে বলতে সুশীতল রাগের মাথায় নিজের ঘরে ফিরে এল।

না, স্কুলের আশেপাশে কোথাও কাউকে দেখা গেল না। ভাড়া বাড়ি নিয়ে কেজি স্কুল। সামনে এক চিল্‌তে ফাঁকা জমি, একটা দোলনা ঝুলছে। ফটকটাও বন্ধ। ভেতরে কোথাও হয়তো দরোয়ান আছে, সুশীতল তাকে দেখতে পেল না। অপেক্ষা করল একটু। তারপর বিরক্ত ভাবে অন্য দিকে হাঁটতে লাগল।

কমলা তাহলে সত্যিই চলে গেল? এখন আর সন্দেহ করার কিছু নেই। যাব যাব করেও এতদিন থেকে গিয়েছিল কমলা, সুশীতল পিসীমার কথা বলে তাকে আটকে রেখেছিল। কিন্তু এটা ঠিক, কমলা যে বাস্তবিকই চলে যেতে পারে সুশীতল তেমন করে ভাবত না। তার সন্দেহ হত, কমলা মুখে যা-ই বলুক হুট করে চলে যাবে না। কোথায় যাবে? কিংবা যায় যদি বলেই যাবে সব। কমলা যাক, সুশীতলের কি-ই বা আসে যায়। তা বলে এই ভাবে চলে যাওয়া কেন? চোরের মতন?

সুশীতল ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে লাগল। কাজকর্ম ফেলে আর বসে থাকা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল, মানুষ কত অকৃতজ্ঞ, জঘন্য হয়, কমলা তার দৃষ্টান্ত। যে বাড়িতে তুমি বিপদের দিনে আশ্রয় পেয়েছিলে, যারা তোমায় গোটা সংসারের মাথায় বসিয়ে দিয়েছিল, কোন দিন কোন রূঢ় অন্যায় আচরণ করে নি, আজ তাদের তুমি পথে বসিয়ে পালিয়ে গেলে! মানুষের স্বভাবই এই, স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বোঝে না।

ট্রাম লাইনের কাছাকাছি আসতেই একটা ট্রাম চলে গেল। সুশীতল অন্যমনস্ক ভাবে দেখল। এ সময় ভিড় কম থাকে। কমই দেখাল তফাত থেকে। এসপ্ল্যানেডের ট্রাম হতে পারে। সুশীতল আজ ডালহাউসির দিকেই প্রথমে যাবে, পরে ধর্মতলা।

ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় পানের দোকান থেকে সিগারেট-টিগারেট কিনে নিল সুশীতল। একটা পানও চাইল। মুখ চেনা দোকানী। পান সাজতে সাজতে সে একটা অ্যাক্সিডেন্টের খবর দিল। আজ সকালে একটা দোতলা বাস রিক্‌শাকে ধাক্কা

মেরেছে। রিক্শা চুরমার। রিক্শাঅলা আর সওয়ারী দুজনেই হাসপাতালে।

সুশীতলের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। অ্যাক্সিডেন্ট! সকালে! যদিও কমলার স্কুল এদিকে নয় তবু তার রিক্শায় ওঠার বাতিক আছে। কমলা কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল নাকি? সুশীতল জানতে চাইল, কোন্ ধরনের সওয়ারী? পানঅলা বলতে পারল না। সে নিজের চোখে কিছুই দেখে নি। তার দাদা সকালে দোকান খোলার সময় দেখেছে।

'জেনানা না মরদানা?'

'জেনানা।'

সুশীতল ভয় পেয়ে গেল। উদ্বিগ্ন।

ততক্ষণে পর পর দুটো ট্রাম এসে পড়ল।

শেষ ট্রামটায় উঠল সুশীতল। বসবার মতন একটু জায়গাও জুটে গেল কপালগুণে। এখন কি করা যায়? হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে বেড়াবে? কোন্ হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া যায়? মেডিকেল না আর জি কর? এখান থেকে মেডিকেলটাই কাছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে খোঁজ নেবে?

কমলার অবশ্য সকাল বেলায় রিক্শা করে এদিকে আসার কথা নয়। কোথায় বা যেতে পারে কমলা তখন—তাও মাথায় ঢুকছিল না সুশীতলের। কমলা নয়, অন্য কেউ হবে। অন্য কারুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

দুশ্চিন্তা বাড়তেই লাগল। সবটাই অনুমান; তবু এসব ক্ষেত্রে মনকে শান্ত করা যায় না। ভয় এবং উদ্বেগ ক্রমশই কেমন ক্লান্ত করে ফেলছিল সুশীতলকে। কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না। কেশবের অফিসে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেশবকে অবশ্য এই ব্যাপারে সুশীতলের তেমন পছন্দ হয় না। কমলাকে নিয়ে কেশব কখনো কখনো যে সব কথা বলে নিতান্ত বন্ধু বলেই সুশীতল সে সব কথা হজম করে নেয়। উপায় কি!

কেশবের অফিসে যাবার আগেই সুশীতল তার বুদ্ধি খরচ করে চেনা-জানা এক অফিস থেকে হাসপাতালে ফোন করল। প্রথমে মেডিকেল তারপর আর জি কর। না, কমলা নামে বা ওই ধরনের চেহারার কোন মেয়েকে সকালে ভরতি করা হয়নি এমারজেন্সিতে। অন্য একজনকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধা। তিনি মারা গেছেন। সুশীতল সামান্য নিশ্চিন্ত হল।

সারা দুপুর ঘোরাঘুরি, এখান ওখান করে সুশীতল শেষ বেলায় কেশবের অফিসে গেল। কেশব নেই। চলে গেছে। অফিস পালিয়েছে। সিনেমায়-টিনেমায় গেছে বোধ হয়।

কল্যাণের অফিসে এসেই বসল সুশীতল। চোখ মুখ শুকনো, দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তায় ভীষণ উসকো-খুসকো, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মেজাজটাও ভাল নয়।

সব শুনে কল্যাণ বলল, 'লালবাজারে ফোন কর।'

'লালবাজারে ?'

'নয়তো আর কোথায় করবি ?'

'বাচ্চা মেয়ে নাকি যে হারিয়ে যাবে ? লালবাজারে ফোন করে কি হবে ?'

'তাহলে চুপ করে বসে থাক। নিজের মর্জিতে সে যখন গেছে তখন কিছু একটা ব্যবস্থা করেই গেছে।'

সুশীতল চুপ করে থাকল। কমলার ব্যবস্থাটা যদি সে জানতে পারত খুশী হত। এ-ভাবে তাকে কেন যে কমলা হায়রানি করল সুশীতল বুঝতে পারছিল না।

কল্যাণ বলল, 'সুসাইড করার মতন মহিলা নাকি ?'

'সুসাইড ?' সুশীতল চমকে উঠল।

'না, বলছি। আজকাল সুসাইড কেস বেড়ে গেছে। আমাদের পাড়ায় সেদিন একটা বুড়ো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।'

সুশীতল বিরক্ত বোধ করল। কমলার সুসাইড করার কোন কারণ নেই। মাথা গরম ধাত হলেই কেউ আত্মহত্যা করে না।

বাড়িতে পিসীমা একা। গোপালীকে বলা আছে। তবু সন্ধ্যে হয়ে গেলে সে কি আর থাকবে? সুশীতল আর অপেক্ষা করল না। ট্রামে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যার মুখে পাড়ায় পৌঁছে গেল সুশীতল। কমলা তাকে অনেক ভুগিয়েছে। আর নয়। কমলা বাঁচুক মরুক, অন্য কোথাও যদি যায় যাক, সুশীতল আর ভাববে না। কিছুই আসে যায় না কমলাকে নিয়ে। কমলা তার কেউ নয়।

পিসীমাকে নিয়েই যা ঝঞ্ঝাট অসুবিধে। পিসীমার ওই প্রায়-অন্ধ চোখ, বুকের রোগ—এই সব ব্যাধি নিয়ে আর সংসার টেনে যাওয়া সম্ভব নয়। কমলা যতদিন ছিল পিসীমাকে সব দিক দিয়েই অবসর দিয়েছিল। কমলা নেই, পিসীমারই অসুবিধে। একটা মেয়ে-টেয়ে ধরে আনতেই হবে। সারাদিনের জন্যে। নয়তো পিসীমাকে বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল। বুড়ি যে কোন্ দিন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে কে জানে!

আজকাল ভাল লোক পাওয়া মুশকিল। বয়স্কা কোন মেয়ে—যে কাজের হবে, বিশ্বাসী, পিসীমার ঝক্কি সামলাবে, সংসারও চালিয়ে যাবে—এমন মেয়ে পাওয়া সহজ নয়। গোপালীকে দিয়ে আপাতত কাজ চালানো ছাড়া অন্য কোন উপায়ও তো সুশীতল দেখতে পাচ্ছে না।

মেজাজের এই অবস্থার মধ্যেও সুশীতলের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। এবার না সত্যিই বিয়ে-থা করতে হয়। করে ফেললেও ক্ষতি কি! চাকরি-বাকরি তো জুটেই গেল। কেশবকে লাগিয়ে দেবে নাকি প্রীতিবউদির সঙ্গে কথা বলতে!

কমলা চলে গিয়ে অবশ্য একটা সুবিধেই হল। মানুষের নানা-রকম সন্দেহ। কমলা যতদিন এ-বাড়িতে ছিল ততদিন একটা খুঁত ছিল। লোকে, মানে মেয়েপক্ষ বলতে পারত, ওই অনাত্মীয় বিধবা মেয়েটিকে তুমি বাপু কেন সংসারের মাথায় বসিয়ে রেখেছ? কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ওর?···

এখন অবশ্য আর কেউ কিছু বলবে না। কমলা নেই।

সুশীতল তার বিশ্রী মেজাজকে যেন খানিকটা হালকা করতে চাইল। বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল সামান্য।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সুশীতল দেখল, একটা রিক্শা দাঁড়িয়ে আছে। সদরের গায়ে। নীচের তলার হতে পারে। কিংবা অন্য কারও।

বাড়ি ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই সুশীতল চমকে গেল। কমলার ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে।

পিসীমা কোথায়? গোপালী কই?

সুশীতল পিসীমাকে ডাকল। সাড়া শব্দ নেই। পিসীমার ঘরের দরজাও খোলা। কয়েক পা এগিয়ে সুশীতল কমলার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমলা খাটের সামনে মাটিতে বসে কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিল। পিঠ দেখা যাচ্ছে কমলার। মাথা ঘাড় নীচু হয়ে রয়েছে।

সুশীতল দাঁড়িয়ে থাকল। সারাদিন যার জন্যে এত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, বিরক্তি সে এইভাবে ঘরে বসে সুটকেশ, বাক্স-টাক্স গুছোচ্ছে? ভাবা যায় না।

কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না সুশীতলের, তবু বলল।

কমলা মাথা ঘোরাল না।

সুশীতল বলল বিরক্ত হয়েই, 'আমাদের এইভাবে ভোগানোর মানে কী?'

এবারও কোন জবাব নেই। সুশীতলের মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। জবাব দেবার দরকারও নেই নাকি কমলার?

আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সুশীতল, কমলা উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে সুশীতলের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।

শেষে সুশীতল রূঢ় ভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

কমলা চোখে চোখে তাকাল। 'গিয়েছিলাম...'

'কোথায় ?'

'যেখানে হোক্।'

'যেখানে হোক্···বাঃ! কাউকে কিছু না বলে, না জানিয়ে সকালবেলায় বাড়ি ছেড়ে গেলে—এখন বলছ যেখানে হোক গিয়েছিলাম! তুমি কি কচি খুকি? কোন বোধ-বুদ্ধি নেই তোমার? এই কলকাতা শহরে একজনের বাড়ি থেকে তুমি পালিয়ে গেলে বোঝ না আমাদের কী অবস্থা হয়?'

কমলা কথাগুলো শুনল। তারপর স্পষ্ট ভাবে বলল, 'আমায় বোঝাতে হবে না ; তুমি নিজে বোঝ।'

'মানে?'

কমলা মুখের কেমন এক ভঙ্গি করল। যেন উপহাস করল সুশীতলকে। বলল, 'পিসীমার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। উনি এখন নিজের ঘরে। পুজো করছেন। আমি আমার কাপড় জামা নিতে এসেছিলাম।'

সুশীতল অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ভিতরে ভিতরে কেমন যেন বিপন্ন বোধ করছিল।

'তুমি কি আবার চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

সুশীতল কথা বলতে পারল না। উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ হলেও এই মুহূর্তে তার কেমন ভয়ও করছিল। কমলার চোখের দিকে তাকাল। কঠিন ঘৃণা রয়েছে চোখে। বিদ্রূপও।

সুশীতল কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে। 'কোন আশ্রমে যাচ্ছ নাকি?'

'যাচ্ছি যেখানে হোক—'

'বলতে আপত্তি?'

'হ্যাঁ।'

আর কোন কথা বলল না সুশীতল। সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের বাইরে চলে এল।

কমলা বাইরে এল আরও একটু পরে। সুশীতল তখন নিজের ঘরে। পিসীমার ঘর থেকে ঘুরে কমলা সুশীতলের ঘরে এল। 'আমি যাচ্ছি।'

জবাব দিল না সুশীতল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কমলা বলল, 'পিসীমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গোপালী কাল পরশুই একজনকে এনে দেবে বাড়ির কাজকর্মের জন্যে।'

সুশীতল এবারও চুপচাপ। কমলা আবার একবার ছোট করে 'আসি' বলল। বলে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সুশীতল জানলার কাছে এল। তাকাল। রিক্শাটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে রিক্শাঅলা।

রিক্শার পায়ের কাছে একটা সস্তা সুটকেশ, পাশে পুঁটলি।

রিক্শা ঘুরিয়ে নেবার পর কমলা কাকে ডাকল ইশারায়।

কমলাই প্রথমে উঠল। তারপর অন্য এক ভদ্রলোক। সুশীতল ভদ্রলোককে কোনদিন দেখে নি আগে। ছিপছিপে চেহারা, কালো, একমাথা চুল।

রিক্শা চলতে শুরু করলে কমলা মাত্র একবার তাকাল বাড়িটার দিকে।

সুশীতল দাঁড়িয়ে থাকল।

কমলা চলে যাবার পর সুশীতল বাইরে আসতেই পিসীমাকে দেখতে পেল।

'কমলা একটা লোকের সঙ্গে কোথায় গেল, পিসীমা?'

'ওর বাড়িতে।'

'লোকটার বাড়িতে?'

'তাই তো বলেছিল।'

'লোকটা কে ?'

'চেনাশোনা।'

সুশীতল অধৈর্যের মতন চিৎকার করে বলল, 'বাঃ! বেশ! এ-বাড়িতে মান সম্মান নিয়ে ছিল, ভদ্রলোকের বাড়ি তার পোষাল না। একটা লোচ্চা লোফারের সঙ্গে চলে গেল! নেমক্‌হারাম।'

পিসীমা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল গোপালীকে কিছু বলতে হবে।

সুশীতল বলল, 'এইভাবে আমাদের মান সম্মান ডুবিয়ে চলে গেল —তুমি কিছু বললে না ?'

'মান সম্মান সকলেই তো আর চায় না।'

সুশীতল বলতে যাচ্ছিল, তাহলে সে কী চায় ? বলতে গিয়েও সুশীতল থেমে গেল। কমলা এ-বাড়িতে কী চাইছিল সুশীতল বুঝি বুঝতে পারল।

পিসীমা ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় অন্ধের মতন। পিসীমার দিকে তাকিয়ে সুশীতল নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে।

কিছুক্ষণ কেমন যেন শূন্য বিষন্ন মনে সুশীতল বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে কল্পনায় একবার ভাবল, রিক্‌শাটা কতদূর চলে গেছে! অনেক দূর কী ?

নয়

অফিস-টফিস সেরে বাড়ি ফিরতে সামান্য দেরীই হয়ে গেল সুশীতলের। প্রথম দিনের অফিস, কাজকর্ম না থাক অফিসের হালচাল জানতে বুঝতে আলাপ-টালাপ সারতেই বিকেল গড়িয়ে গেল। কথা ছিল, কেশবকে একটা ফোন করবে, সময় পাচ্ছিল না; সময় পেল বিকেলে, কেশবকে পাওয়া গেল না।

অফিসটা সুশীতলের খারাপ লাগে নি। ছোটখাট অফিস। বাজারী ব্যাপার নেই। কারখানা সেই বেহালায়, অফিস মিশন রো-য়ে। সুশীতলকে অফিসেই বসতে হবে আপাতত, মাঝে-সাঝে কারখানায় যেতে হতে পারে; অবশ্য সেটা পরের কথা।

অফিসে গিয়ে নানা রকম কথা মনে পড়ছিল। বার্ড কোম্পানীতে প্রথম যেদিন চাকরি করতে যায় সুশীতল তখন তার বয়েস ছিল কম। বাবা বেঁচে ছিল। বাবার দৌলতেই চাকরি। বাবা মারা গেছে বছর ছয়েক হল। বার্ড কোম্পানীতে সুশীতলের চাকরি হয়েছিল সাত বছর। সেই চাকরি মাথা গরম করে ছেড়ে দিয়ে সুশীতল ভাল কাজ করে নি। নিজের বোকামির ফল সুশীতল এই ক'মাস কম ভুগল না। রীতিমত শিক্ষাই হয়ে গেছে তার। আর কোন বোকামি সে করবে না; এই চাকরিটা তাকে বজায় রাখতেই হবে। বয়েস হয়ে-গেছে সুশীতলের, এখন নিজেকে নিয়ে ছেলেখেলা করলে চলবে না।

প্রথম দিন অবশ্য একটু এলোমেলো লাগছিল। মানে চাকরি না করার ফলে যে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তাতে অফিসে বসে থাকতে তেমন ভাল লাগছিল না। আবার এই ক'মাস যেভাবে এখানে-সেখানে

ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে সেই দৌড় ঝাঁপ এবং ক্লান্তি থেকে রেহাই পেয়ে একটু আরাম আরাম লাগছিল। সুশীতল এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না অবশ্য, দু-চার দিনের মধ্যেই তার পুরোনো অফিস-ধাত ফিরে আসবে।

বাড়ি এসে সুশীতল দেখল, পিসীমা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে. গোপালী রান্নাঘরে। গোপালী আর খানিকটা পরেই চলে যাবে। তার পক্ষে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকার নানা অসুবিধে, অথচ সে লোক যোগাড় করে দিতেও পারছে না, চেষ্টা করছে।

সুশীতল অফিসের পোশাক ছেড়ে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এল খানিকটা পরে। গোপালীই চা জলখাবার করে রেখেছে। পিসীমা নিজেই চা জলখাবার নিয়ে ঘরে এল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

'অফিস করলি?' পিসীমা বলল।

'করলাম। ছোট অফিস।'

'তা হোক; আবার ঝগড়া ঝাটি করিস না।'

সুশীতল চা জলখাবার নিয়ে বসল। পিসীমা বিছানায় গিয়ে বসেছে।

দু-চারটে তুচ্ছ কথা। তারপর পিসীমা বলল, 'আজ কমলা এসেছিল।'

তাকাল সুশীতল। 'কমলা! হঠাৎ?'

'খোঁজ খবর নিতে এসেছিল,' পিসীমা বলল, 'ওর কিছু জিনিসও পড়ে আছে, দু-একটা কি নিয়ে গেল।'

সুশীতল খাচ্ছিল। গলায় যেন আটকে গেল খাবার। পিসীমার ওপর নয়, অথচ কিসের যেন এক বিরক্তি বোধ করছিল। বলল, 'আমাদের খোঁজ খবর নেবার দরকার তো ওর নেই। আর জিনিসপত্র যা পড়ে আছে সব একসঙ্গে নিয়ে গেলেই পারে।'

পিসীমা কথার জবাব দিল না। গায়ের চাদরটা গোছালো। বোধ হয় শীত করছে। চশমাটা নাকের তলায় নেমেছে। নতুন চশমা, কিন্তু ঢিলেঢালা।

সামান্য চুপচাপ।

সুশীতল নিজেই আবার বলল, 'কখন এসেছিল ?'

'স্কুলের ছুটির পর।'

'অত বেলায় ?' বলার পর সুশীতলের মনে হল, কথাটা কেন বলল সে, কেন ?

পিসীমা বলল, 'স্কুল ফেরত এসেছিল। আমি বললাম, চান-টান করে দু' মুঠো খেয়ে যেতে।'

'বাঃ !'

'কিসের বাঃ !'

'তুমি নিজেই পারো না, আবার শংকরাকে ডাকছ ?'

'কেন, গোপালী ছিল।'

'ও !' সুশীতল অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

পিসীমা বলল, 'চান-টান এখানেই করেছে। খেতে চাইছিল না। পরে খেয়েছে।'

সুশীতল কোন সাড়াশব্দ করল না।

'গোপালীর ওপর রাগ করছিল,' পিসীমা বলল, 'এখনও লোক আনতে পারছে না।'

সুশীতল রুক্ষ গলায় বলল, 'কলকাতা শহরে লোক এমন কিছু বসে বসে কাঁদে না। তোমার কমলা কি মনে করে তুড়ি মারলেই লোক এসে যাবে।'

'ঠিকই তো! লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে রাগ করছিল।'

'ওর রাগে কি যায় আসে? যাবার সময় সব তো জেনেই গিয়েছে! এখন আর মায়া দেখিয়ে কি লাভ!'

পিসীমা চুপ। কোন জবাব নেই। হয়তো জবাব দেবার কিছু ছিল না।

সুশীতল খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ টেনে নিল। কমলা আবার এ-বাড়িতে আসবে সে ভাবে নি। তার স্কুল অবশ্য কাছে। স্কুল ফেরত খোঁজ নিতে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু যে-কমলা তেজ দেখিয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে কেন আসবে? যদি বা এসেই থাকে—কেন সে স্নান খাওয়া করবে? পিসীমার কথায়? হতে পারে।

'তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।' পিসীমা বলল।

'আমার কথা?'

'তোর আজ চাকরিতে যাবার কথা। জানতে চাইছিল—।'

সুশীতল তাকাল। পিসীমার মুখ সাদামাটা। মাথা ভরতি পাকা চুল। গালের তলায় কত কালের সেই দাগ। পিসীমাকেই দেখছিল সুশীতল; অন্যমনস্ক। পিসীমার মুখের পাশে কমলার মুখের কেমন যেন একটা ছবি অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠছে। কমলা যেন সুশীতলকেই লক্ষ করছিল। দেখতে চাইছিল সুশীতল শেষ পর্যন্ত কি করে! কমলা তার চাকরির কথা মনে রেখেছে! জানতে এসেছিল, সুশীতল চাকরিতে গেল কি না?

কিন্তু কমলার এই আগ্রহ থাকার কথা নয়। অন্তত সে যে ভাবে রাতারাতি কাউকে কিছু না জানিয়ে, গোটা একটা দিন সুশীতলকে উদ্ব্যাস্ত করে, ভয় পাইয়ে, শেষে নাটক করে চলে গেছে তাতে কমলার আর এ-বাড়িতে আসা অথবা পিসীমা কিংবা সুশীতলের খোঁজ-খবর করা সাজে না। কমলা আবার একটা নাটক করতে এসেছিল বোধ হয়।

পিসীমা উঠছিল, সুশীতল হঠাৎ বলল, 'কোথায় আছে ও?'

বাগবাজারে।'

'বাগবাজারে? বাগবাজারে কোথায়?'

'কিসের একটা জায়গা আছে বলল মেয়েদের—, ওই আশ্রম মতন—।'

'আশ্রম মতন—! কোন্ আশ্রম?'

মাথা নাড়ল পিসীমা। 'তা কিছু বলল না।'

সুশীতল পিসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সরাসরি ; একটু যেন সন্দেহ। সত্যিই কি জানে না পিসীমা ? কমলা কিছু বলে নি ? পিসীমাও জিজ্ঞেস করে নি ?

অপেক্ষা করছিল সুশীতল, আরও কিছু শোনা যেতে পারে।

পিসীমা চুপচাপ।

সুশীতল বলল, 'তোমায় একটা ধাপ্পা মেরে গিয়েছে।'

'ধাপ্পা ?'

'তা ছাড়া কি ! কিসের আশ্রম ? কার আশ্রম ? আশ্রম তো অনেক রকম হয়।'

পিসীমার মুখ দেখে মনে হল, অত খবর তার জানা নেই। বলল, 'মেয়েদের আশ্রম বলল। বাগবাজারে।'

সুশীতল খুশী হল না। বাগবাজারে মেয়েদের কোন্ আশ্রম আছে সে জানে না। আছে কি না তাও তার জানা নেই। আজকাল কলকাতায় আশ্রম খুলে বসে থাকার মতন মাতব্বর বড় একটা চোখেও পড়ে না ! এককালে 'বিধবা আশ্রম' 'নারী আশ্রম' চোখে পড়ত।

পিসীমা উঠে যাচ্ছিল, সুশীতল কিছু বলল না।

চলে গেল পিসীমা। সুশীতল চা শেষ করল। উঠল। ভাল লাগছিল না। উঠে গিয়ে সিগারেট খুঁজে নিয়ে ধরাল।

কমলা যদি বাগবাজারের কোন আশ্রমে উঠে থাকে সুশীতল জানতে পারবে। কেশব বাগবাজারে থাকে। আশ্রম-টাশ্রমের খবর কেশবের নিশ্চয় জানা আছে। তবে সুশীতল মনে করে না, কমলা কোন আশ্রমে গিয়ে উঠেছে। আশ্রমে থাকার মতন মানুষ কমলা নয়। ওই মেজাজ, রুক্ষ স্বভাব, দাপট—আশ্রমে থাকার উপযুক্ত নয়। কমলা অন্য কোথাও যেতে পারে। কিন্তু কোথায় ?

সুশীতল ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গলিতে তেমন কিছু আলো নেই, অন্ধকারটাই বেশী। গলির দিকে তাকালেই কমলার কথা মনে হচ্ছিল। সেই রিক্‌শা ! কমলা

রিক্‌শায় উঠে চলে যাচ্ছে। তার পাশে অজানা অচেনা একটা লোক। লোকটাকে সুশীতল ভাল করে দেখতে পায় নি; কিন্তু তার পোশাক-আশাক মনে আছে। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। যেটুকু নজরে পড়েছিল সুশীতলের তাতে তার ভাল লাগে নি। চ্যাঙড়া, রকবাজ, বাজে ধরনের মনে হয়েছে লোকটাকে।

কমলা ছেলেমানুষ নয়, বোকা নয়। সুশীতল মনে করে না যে, রাতারাতি বা হঠাৎ একটা লোক জুটিয়ে এনে সে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এটা কলকাতা শহর; কোন মেয়ের পক্ষেই রাতারাতি বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কমলাকে অত মূর্খ, বেহিসেবী ভাবার কোন কারণ নেই। এবং সুশীতল মনে করে, কমলা জেনে শুনে বুঝেই সব ব্যবস্থা করেছে। মাস কয়েক ধরেই কমলার মুখে 'চলে যাব চলে যাব' বুলি ছিল। সুশীতল যদিও প্রথম প্রথম সেটা গ্রাহ্য করত না, বরং ভাবত ওটা এক ধরণের ভয় দেখানো, শূন্যগর্ভ আওয়াজ; কিন্তু পরে তার সন্দেহ হত। সন্দেহ হত, কমলা কোথাও কোন ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে। আর বাস্তবিকই সুশীতল ভেবেছিল, কমলা কোন গুরু-টুরু ধরেছে বোধ হয়, আজকাল গুরুর বেশ হিড়িক। কোন গুরু ধরতে পারলে কমলা কলকাতার কাছাকাছি কোন আশ্রমে গিয়ে গেড়ে বসতে পারে।

অবশ্য গুরু ধরার ব্যাপারে কমলার আগ্রহ থাকা উচিত নয়। যে ধরণের লোক গুরু ধরে, বিশেষ করে মেয়েরা, কমলার স্বভাব তা নয়। কমলা ধর্মভীরু নয়, ঠাকুর দেবতা নিয়ে তাকে বিচলিত হতে সুশীতল কখনো দেখে নি, কমলা পুজো আচ্চাও করত না। যে মেয়ের মতি-গতি অন্য রকম, যার মধ্যে সংস্কার কিংবা ধর্মভীরুতা নেই, বরং যে যথেষ্ট সাহসী, বেপরোয়া—সেই মেয়ে গুরু ধরবে এমন ভেবে নেওয়া মুশকিল।

সুশীতলের আজ সন্দেহ হচ্ছিল, কমলা মোটেই গুরু-টুরু ধরে নি। সে অন্য কিছু ধরেছে, আর সেটা রাতারাতি নয়। কমলা নিশ্চয়

কাউকে ধরেছে, মানে এমন কেউ রয়েছে যার সঙ্গে কমলার আলাপ ভাব-সাব ছিল। গোপনে গোপনে হয়তো কোন সম্পর্কও গড়ে তুলেছিল কমলা। সেই লোকটাই এখন তার আশ্রয়।

কিন্তু লোকটা কে? যে কমলাকে এই বাড়ি থেকে রিক্‌শায় চাপিয়ে নিয়ে গেল সে নাকি? যদি সে হয় তবে কমলার ভবিষ্যৎ সুশীতল অনুমান করতে পারছে। এবং ঘৃণাও হচ্ছে।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সুশীতল টেবিল থেকে একটা পুরোনো কাগজ তুলে নিল। নিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। অন্যমনস্ক। ভাল লাগছে না কিছুই।

সুশীতল শুয়েই ছিল চুপচাপ। কমলার কথা ভাবছিল। কমলা যতদিন এ-বাড়িতে ছিল সুশীতল এক অশান্তি ভোগ করেছে। এখন কমলা নেই, তবু অশান্তি। কমলা যেদিন চলে গেল সেদিন থেকেই আর-এক অশান্তি ভোগ করছে সুশীতল। আশ্চর্য! এক একজন মানুষ থাকে—যারা অন্যকে অশান্তি ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারে না। কমলা সেই রকম মানুষ।

আচমকা গলা পাওয়া গেল কেশবের। কেশব এসেছে।

সুশীতল বিছানার ওপর উঠে বসতে বসতে শুনল, কেশব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পিসীমার সঙ্গে কথা বলছে।

সামান্য পরে কেশব ঘরে এল। 'কি রে?'

সুশীতল বলল, 'তোকে ফোন করেছিলাম।'

'বিকেলে আমি ছিলাম না,' কেশব বিছানায় এসে বসল, 'আমাদের এক কোলিগের বাবা মারা গিয়েছেন, টালিগঞ্জ গিয়েছিলাম।'

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সুশীতল। কেশবের কয়েকটা সদ্‌গুণ রয়েছে, খুবই সামাজিক এবং কর্তব্যপরায়ণ। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব—কার কোথায় কি ঘটছে কেশব তার খোঁজ রাখে, আসা-যাওয়া করে।

কেশব বলল, 'তুই ফোন করবি আমি জানতাম। ভাবলাম টালিগঞ্জ থেকে ফেরার পথে তোর বাড়ি ঘুরে যাব।'

'সোজা টালিগঞ্জ থেকে আসছিস ?'

'না। টালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে একবার ভবানীপুরে নামলাম। মামার খোঁজ খবর নেওয়া হয় না, একবার মুখ দেখিয়ে এলাম। তারপর বল, তোর অফিস কেমন হল।'

'ভালই।'

'কেমন লাগল ?'

'খারাপ নয়। ছোট অফিস। লোকজনও কম।'

কেশব সিগারেটের প্যাকেট বার করল। 'ছোট অফিসই ভাল। তোর এলেম দেখাতে পারলে চড়চড় করে গাছে উঠে যাবি।'

সিগারেট ধরানো হল। অফিস সংক্রান্ত দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তা হল কিছুক্ষণ। শেষে কেশব বলল, 'পিসীমা আরও কাহিল হয়ে পড়েছে দেখলাম।'

সুশীতল মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, 'বাগবাজারে কোন আশ্রম আছে নাকি রে ?'

কেশব কথাটা বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, 'আশ্রম ?'

'তুই তো বাগবাজারের গেজেট।'

'ব্যাপার কি ?'

'মেয়েদের কোন আশ্রম আছে জানিস ?'

কেশব কিছুই অনুমান করতে না পারলেও বলল, 'থাকতে পারে। কেন ? পিসীমাকে আশ্রমে পাঠাতে চাস নাকি ?' বলে হাসল।

সুশীতল সামান্য দ্বিধা করে বলল, 'কমলা আজ দুপুরে এসেছিল। পিসীমাকে বলে গেছে, বাগবাজারে মেয়েদের যেন কোন্ এক আশ্রমে রয়েছে।'

কেশব এতক্ষণে ধরতে পারল ব্যাপারটা। সুশীতলের দিকে তাকিয়ে থাকল দু' পলক, তারপর শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'কমলা! তাই বল।'

সুশীতল কথা বলল না। কেশব কমলার ব্যাপারে বরাবরই সন্দেহপরায়ণ। মাঝে মাঝে রসিকতাও করে। এ-বাড়িতে কেশব

যখনই এসেছে কমলাকে নজর করেছে খুঁটিয়ে। কমলা কেশবকে তেমন পছন্দও করত না। হয়তো কেশবও করে না।

কেশব কেমন করে যেন হাসল। 'তা কমলা হঠাৎ যে আবার এল?'

সুশীতল অস্বস্তি বোধ করছিল। 'জানি না।'

'জানিস না?···তুই বেটা সাবালক না নাবালক?'

'বাঃ, কমলা কেন এসেছিল আমি কেমন করে জানব! আমায় বলে আসে নি। পিসীমার কাছে এসেছিল পিসীমার কাছ থেকেই চলে গেছে।'

কেশব কথা বলল না। সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে বসে থাকল।

গোপালী চলে গেছে। পিসীমাই চা করছে বোধ হয় কেশবের জন্যে। সুশীতলের কি মনে হল, উঠে পড়ল। বলল, 'বোস একটু, আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পরে সুশীতল ফিরে এল চা নিয়ে।

কেশব বলল, 'তুই কমলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস?'

'আমি! না'

'বাজে কথা বলিস না।'

সুশীতল অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'ব্যস্ত তুই কাকে বলছিস! একটা মেয়ে, বয়স্কা মেয়ে, এ-বাড়িতে থাকত। তুই কমলার হিস্ট্রি জানিস। সেই মানুষটা হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল—দুশ্চিন্তা হবারই কথা। তোরও হত।'

কেশব আরাম করে চায়ে চুমুক দিল। বলল, 'হত। কিন্তু তুই যখন দেখছিস সে জলে পড়ে নি, দিব্যি বেঁচে রয়েছে—তখন তোর দুশ্চিন্তা হবার কারণ কি?'

'দুশ্চিন্তা আমার হয় নি'—সুশীতল বিব্রত হয়ে বলল, 'আমি মোটেই দুশ্চিন্তা করছি না। কিন্তু এটা কলকাতা শহর। তুই তো জানিস এই ধরনের মেয়ে-টেয়েদের হাতে পেলে কত রকম বাজে কাণ্ড হয়।'

কেশব বন্ধুর মুখের দিকে মজার চোখেই তাকিয়ে থাকল। বলল, 'কমলা ছেলেমানুষ নয়। তার নিজের বোধ বুদ্ধি আছে।'

সুশীতল মাথা নাড়ল। 'বুদ্ধি থাকলে কেউ নিজের নাক নিজে কাটে না।'

কেশব হেসে ফেলল। চা শেষ হয়ে এসেছিল তার। বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে কমলা তোর নাকই কেটে দিয়েছে।'

সুশীতল কথা বলতে পারল না। বিরক্তির চোখে তাকাল।

কেশব আর বসল না। উঠে পড়ল। সিগারেট ধরাল। 'চলি—'

সুশীতল উঠল। কেশবকে এগিয়ে দেবে।

বাইরে এসে কেশব একবার পিসীমার ঘরের দিকে গেল। ফিরে এল কথা বলে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেশব বলল, 'কমলার খবর নেব নাকি রে?'

মাথা নাড়ল সুশীতল। 'না।'

'কেন! তুই যে বলছিলি!'

'আমি খবর নিতে বলি নি।...কমলা পিসীমাকে বাজে কথা বলে গেছে নাকি জানতে চাইছিলাম।'

কেশব ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল একবার।

সদর পর্যন্ত কেশবকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল সুশীতল।

নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে পড়ায় কমলার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো রয়েছে।

সুশীতল দরজা খুলে ভেতরে এল। অন্ধকার। বাতি জ্বালল।

কমলা চলে যাবার পরও এই ঘর দেখে বোঝা যায় না যে সে নেই। চলে গিয়েছে। বিছানা পরিষ্কার। চাদর বালিশ সবই পড়ে রয়েছে। টেবিলের ওপর ভাঁজ করা খবরের কাগজ দু-চারটে, এক-আধটা বই। কালির শিশি।

সুশীতল অন্যমনস্ক ভাবে দেখছিল ঘরটা।

দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার। একটা ছবি—কমলাদের স্কুলের। সস্তা আলনার ওপর কমলার একটা ময়লা পুরোনো শাড়ি পড়ে আছে। আলনার নীচে কিছু টুকিটাকি।

সুশীতল টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

মামুলী একটা খাতা। পাতা ওল্টালো সুশীতল। সংসার খরচের হিসেব। রেশন, বাজার খরচ, তেল, ডাল, ইলেকট্রিক বিল।

পাতাগুলো উলটে যেতে যেতে সুশীতল দেখল, কমলা এক জায়গায় একটা ছবি এঁকেছে কলম দিয়ে। অদ্ভুত ছবি। প্রায় ভূতের মতন।

ছবিটা দেখতে দেখতে সুশীতলের হঠাৎ সন্দেহ হল। ছবিটা কার? তার নাকি?

খাতা বন্ধ করে দিল সুশীতল। বাতি নিবিয়ে বাইবে এল।

বাইরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকারে।

দশ

বারকয়েক কড়া নাড়ার পর সদর খুলল। আধাআধি।

'কাকে চাই ?'

সুশীতল ভাল করে মুখ দেখতে পেল না মহিলার। বলল, 'কমলাকে।'

দরজা আধাআধি বন্ধ রেখেই ভেতর থেকে জবাব এল। 'কে আপনি ?'

সুশীতল বলল, 'কমলার আত্মীয়। আমার নাম সুশীতল।'

সামান্য অপেক্ষা করে মহিলা বলল, 'আসুন।'

দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল সুশীতল।

সুশীতল প্রথমে ভেবেছিল কোন কমবয়েসী মেয়ে দরজা খুলেছে। ভেতরে এসে দেখল তার ভুল হয়েছে; গলার স্বর সরু হলেও মহিলা বয়স্কা। রোগা লম্বা চেহারা।

মাঝ মধ্যিখানে চাতাল। ময়লা জমে রয়েছে এক কোণে। রান্নাবান্নার গন্ধ আসছিল আশপাশ থেকে।

সুশীতলকে ডান দিকের সরু মতন একটা ঘরে বসতে বলে মহিলা চলে গেলেন। অবশ্য বাতিটা জ্বেলে দিয়েছিলেন।

সুশীতল বসল না। গোটা দুই নড়বড়ে চেয়ার, একটা বেঞ্চি, ছোটখাট এক টেবিল। দেওয়ালে জগদ্ধাত্রীর ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার। ঘরটা শুধু ছোটই নয়, নোঙরা। একপাশে কিছু পানের দোনা, ছেঁড়া কাগজ, মাটির খুরি পড়ে আছে। দম আটকানো গন্ধ ভেতরে। জানলা আছে একটা। কিন্তু বন্ধ।

সুশীতল বুঝতে পারল না, কমলা এখানে কেমন করে আছে।

অপেক্ষাই করতে হল সুশীতলকে। কমলা কি নেই? নাকি আসতে দেরী করছে!

ঘরের বাইরে প্লায়ের শব্দ হল।

সুশীতল মুখ ফেরাতেই কমলাকে দেখতে পেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

কমলা খানিকটা অবাক চোখে সুশীতলকে দেখছিল।

কথা বলতে পারল না সুশীতল। কমলাকেই দেখছিল। স্বাভাবিক চেহারা কমলার। বরং পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নই দেখাচ্ছিল।

কমলা নিজেই বলল, 'পিসীমার কিছু হয়েছে?'

'না', মাথা নাড়ল সুশীতল।

'তা হলে?'

সুশীতল ঢোঁক গিলল। বলল, 'দেখতে এলাম।'

কমলা ভুরু কোঁচকাল। 'আমায় দেখতে এসেছ?'

'হ্যাঁ। আসতে নেই?'

'পিসীমা পাঠিয়েছে?'

'পিসীমা কেন পাঠাবে, আমি নিজেই এসেছি।'

কমলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, না বলে ঠোঁট কামড়ে আড় চোখে তাকিয়ে থাকল।

সুশীতল বলল, 'তুমি আজকাল স্কুল যাও না?'

কমলা তাকিয়ে থাকল, 'আমার স্কুলে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। শুনলাম তুমি তিন চার দিন যাচ্ছ না।'

মাথা নাড়ল কমলা। যাচ্ছে না স্কুলে।

'কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ? জ্বর জ্বালা?' সুশীতল বলল, আজ সে একেবারেই অকারণে আসে নি। কথা বলতেও তার আটকাবে না।

কমলা কি মনে করে বলল, 'হ্যাঁ।'

সুশীতল বলতে যাচ্ছিল, দেখে তো মনে হচ্ছে না—, সামলে নিল।

কমলা সামান্য অপেক্ষা করে বলল, 'কি দরকার তোমার? বসো।'

সুশীতল বসল। বলল, 'তোমাদের এই আশ্রমটা কিসের?'

'কেন?'

'বাইরে কিছু লেখা নেই।'

'মেয়েদের আশ্রম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কোন্ মেয়েদের? বিধবাদের, না অনাথ মেয়েদের?'

কমলা কোন জবাব দিল না কথার। আবার বলল, 'তোমার কি দরকার বল।'

সুশীতলও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, 'একটু বেরুতে পারবে?'

কমলা ভাল বুঝল না। 'কোথায়?'

'বাইরে। দরকার আছে।'

'এই সন্ধ্যেবেলায়?'

সুশীতল ঠাট্টা করে বলল, 'সন্ধ্যেবেলায় কি তোমাদের বেরোনো নিষেধ!'

কমলা মাথা নাড়ল। 'নিয়ম নয়। খুব দরকার ছাড়া বেরোনো যায় না।'

'ও, আচ্ছা!'

সুশীতল নীরব। কমলাও।

সামান্য পরে কমলা বলল, 'তুমি অফিস যাও নি?'

'আজ শনিবার। বিকেলের মধ্যেই ফিরেছি।'

'পিসীমা কেমন আছে?'

'ভাল নয়। মানে যেমন ছিল।'

কমলা চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শাড়িটা নতুন বোধ হয়। সুশীতল আগে দেখে নি। সাদা খোলের ওপর নীল ফুল। গায়ে চাদর রয়েছে কমলার।

'তোমার কিসের দরকার? এখানকার ঠিকানা তোমায় কে দিল?' কমলা আধার বলল।

সুশীতল দেওয়ালে ঝোলানো জগদ্ধাত্রীর ক্যালেণ্ডারটা দেখছিল। বলল, মজার চোখেই 'তুমি তা হলে বেরোতে পারছ না?'

কমলা কিছু ভাবল। বলল, 'পারি। ওপরে গিয়ে বলতে হবে। কখন ফিরতে পারব?'

'ঘণ্টা দেড় দুই।' সুশীতল নিজের ঘড়ি দেখল। 'ন'টার মধ্যেই।'

কমলা যেন হিসেব করল মনে মনে, বলল, 'বস, দেখছি।'

কমলা চলে গেল।

রাস্তায় এসে সুশীতল এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, 'রিক্‌শা নেব?'

'কোথায় যাবে?'

ভাবল সুশীতল। যাবার মতন জায়গা তার নেই। মাঠে ময়দানে পার্কে যাবার সময় এটা নয়। চায়ের দোকানে যাওয়া যায় না। অথচ কমলার সঙ্গে কথা আছে। দরকারী কথা। সুশীতল নিজেকে পুরোপুরী তৈরী করে নিয়েই এসেছে আজ।

কথা বলার মতন একটু জায়গা কোথায় পাওয়া যায়! কোথায়?

সুশীতল বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে লাভ কি! চল, একটা রিক্‌শা নি।'

'কোথায় যাবে?'

'চল না, খানিকটা যাই—তারপর...' বলতে বলতে হাত তুলে রিক্‌শা ডাকল সুশীতল।

রিক্‌শা এল।

কমলার যেন ইচ্ছে ছিল না। কোথায় যাবে, কোন্ দিকে— কিছুই ঠিক নেই রিক্‌শা ডেকে বসল সুশীতল।

কমলা উঠে বসল। সুশীতল রিক্‌শাঅলাকে সোজা যেতে বলল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর দিকে।

রিকশায় উঠে সুশীতল কথা বলল না। অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ধরাল।

কমলা গায়ের চাদর গুছিয়ে নিয়ে কথা বলল, 'যাচ্ছ কোথায় ?'

'চল না, দেখি— ।'

কমলা কথা বলল না আর।

রিক্‌শা খানিকটা এগিয়ে আসার পর সুশীতল বলল, 'তুমি এখানে আছ কেমন করে ?'

'কেন ?'

'ওটা তো অন্ধকূপ মনে হল। নোংরা।'

'অনেকেই থাকে। আমি কেন পারব না ?'

সুশীতল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কমলাকে। 'কারা থাকে আমি জানি না। যারাই থাকুক দায়ে পড়ে থাকে। না হয়—। যাকগে, আমি তোমায় দুটো কথা জিগ্যেস করতে চাই।'

'বল।'

সামান্য সময় নিল সুশীতল। 'তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলে কেন ? আমি তোমায় বাড়ি থেকে চলে আসতে বলি নি ; তাড়িয়ে দিই নি। আমার নিশ্চয় কিছু অন্যায় হয়েছিল। তার জন্যে মাফ চেয়েছি।'

কমলা শুনছিল। মুখ না তুলেই। রিক্‌শাটা হেলে দুলে চলছে।

সুশীতল বলল, 'তুমি নিজেই জানো, আমাদের কোন্ অবস্থার মধ্যে ফেলে এসেছ তুমি। পিসীমা যে কোন দিন একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে। আমি অফিসে গিয়ে স্বস্তি পাই না। বাড়ি এসেও একই অবস্থা।

কমলা মুখ তুলল। 'তাহলে পিসীমার জন্যে তুমি আমার কাছে এসেছ ?'

সুশীতল ঘাড় ঘোরাল। কমলার গলায় চাপা ঝাঁঝ। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। রিক্‌শাঅলাকে বলল, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনু দিয়ে সোজা বিডন স্ট্রীটের দিকে যাবার জন্যে।

কমলা অপেক্ষা করে থাকল।

সুশীতল বলল, 'পিসীমার জন্যে ঠিক আসি নি।'

'তবে?'

কী বলবে সুশীতল! মুখে কথা আসছিল না। কেমন যেন দুর্বল লাগছিল নিজেকে। ভয়ের মতন। বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি যদি করতে চাও—'

কমলা বাধা দিল, বিরক্ত হয়েই। বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতে চাই না। তোমাদের বাড়িতে যতদিন থেকেছি ততদিন না হয় সে দুর্নাম দিয়েছ।' বলে কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

দুজনেই চুপচাপ।

সুশীতল অকারণে বারকয়েক কাশল।

কমলাই হঠাৎ বলল, মুখ ফিরিয়ে, 'তুমি ছেলেমানুষ নও। আমিও নই। ছেলেমানুষদের মতন কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। তোমার যা বলার স্পষ্ট করে বল।'

সুশীতল নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিল। এলোমেলো কথা বলার সত্যিই কোন মানে হয় না। সুশীতল সে জন্যে আসে নি।

সুশীতল বলল, 'বেশ। আমি বলছি।...তুমি এভাবে চলে এসে অন্যায় করেছ।'

'কেন?' কমলা সুশীতলের দিকে ঘাড় ঘোরাল।

'যে ছেলেটা সেদিন তোমায় নিয়ে এসেছে—তাকে আমি দেখেছি। ভাল লাগে নি আমার।'

'ছেলেটাকে তোমার ভাল না লাগলে আমি কী করব?'

'ও কে?'

'আমার চেনা?'

'এই আশ্রমের ?'

'না। তবে ওর জানাশোনা আছে আশ্রমের সঙ্গে।'

'ও! ...আমি তোমায় একটা কথা বলি। তুমি এই সব আশ্রম-টাশ্রমে উঠে ভুল করেছ। কলকাতা যে কেমন জায়গা তুমি জানো না! আমি কেশবকে দিয়ে খবর নিয়েছি। এই আশ্রমের সুনাম নেই।'

কমলা যেন সবই জানত। বলল, 'কেশব তোমায় ঠিকানা দিয়ে এসেছে ?'

সুশীতল জবাব দিল না কথার।

রিক্‌শা একটা মোড় ছাড়িয়ে এল।

কমলা বলল, 'তোমার কি ভয় হচ্ছে, আমি কোথাও চলে যাব! অন্য কারও সঙ্গে।'

সুশীতল বিব্রত বোধ করল। বলল, 'তুমি মানুষজন চেনো না। কতটুকু চেনো ? এই কলকাতায় কত রকম...'

'আমায় তুমি কচি খুকি ভাবছ ?'

'মানে ?'

'আমার যদি কারও সঙ্গে কোথাও যাবার দরকার হয়—জেনে শুনেই যাব। আমায় ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না কেউ। সে বয়েস আমার নেই।'

সুশীতল যেন আহত হল। বলল, 'এমন কেউ আছে ?'

কমলা তাকাল। 'থাকলেই বা, তোমার কি।'

সুশীতল চুপ করে থাকল।

কমলা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল সুশীতলকে। ম্লান, আহত, গম্ভীর

'তুমি একটা কাজ করছ না কেন ?' কমলা বলল।

সুশীতল তাকাল।

'পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে নিচ্ছ না কেন।' কমলা বলল 'বিয়েটা সেরে ফেল। পিসীমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। নিজের ঝঞ্ঝাট কমবে।'

সুশীতল অপ্রসন্ন গলায় বলল 'তামাশা করছ ?'

কমলা বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'তামাশা করব কেন! যা করলে ভাল হয়—একূল ওকূল দু'কূলই বজায় থাকে তার কথাই বলেছি।

সুশীতল সামনের দিকে তাকাল। গ্রে স্ট্রীটের মুখে পৌঁছে গিয়েছে রিক্‌শা। ওপারে—কি লোড্‌ শেডিং? এত অন্ধকার লাগছে কেন? একটা ট্রাম চিৎপুরের দিকে চলে যাচ্ছিল।

সুশীতল বলল, 'তোমার হাতে মেয়ে আছে?' ঠাট্টার গলাতেই বলল। কিংবা ওপরে ঠাট্টা থাকলেও ভেতরে খোঁচা আছে।

'আমার হাতে থাকবে কেন, তোমার হাতেই তো রয়েছে—' কমলা বলল।

সুশীতল বুঝতে পারল না। 'আমার হাতে?'

হাসল যেন কমলা।

সুশীতলের সন্দেহ হল। কমলা কি প্রীতিবউদিদের ব্যাপারটা মনে রেখেছে! নাকি নিতান্তই ঠাট্টা করছে? অবশ্য এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যাতে কমলা তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারে। একমাত্র প্রীতিবউদির একটা চিঠি ছাড়া কমলা তো কিছু দেখে নি। তবে?

'আমার হাতে কেউ নেই—' সুশীতল বলল, বলেই থেমে গেল। তারপর প্রায় যেন মুখ ফসকেই বলে ফেলল, 'আর যে আছে—' কথাটা শেষ করল না।

কমলা কেমন যেন থমকে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুশীতলকে।

সুশীতল কেমন যেন সাহস পেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি যেভাবে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ—এটা আমার ভাল লাগছে না। পিসীমাও খুব কষ্ট পেয়েছে। তুমি কেন যাবে?'

কমলা শুনল। একেবারে চুপচাপ। মুখ ঘোরাল না।

সুশীতলের বুকের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল। গলার কাছে কি যেন জড়িয়ে যাচ্ছে।

রিক্‌শা পার্কের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল।

সুশীতল বলল, 'আমি তোমায় একটা কথা বলব। আমার নিজের দিকে আমি এখন তাকাচ্ছি না। পিসীমাকে তুমি কেন ফেলে যাবে! ওই বুড়ো মানুষটা যদি আগুনে পুড়ে মরে, তোমার কেমন লাগবে! এই পিসীমা...'

কমলা বাধা দিল। বলল, 'পিসীমার জন্যেই তুমি আমায় ফিরে যেতে বলেছ?'

সুশীতল বলব কি বলব না করে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'না, আমার জন্যেও।'

কমলা যেন জানত, যেন অপেক্ষা করছিল—সামান্য কাঁপল।

রিক্শাটা অন্ধকারেই বিডন স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চলল।

অমৃত কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিল। ভদ্রমহিলা এমন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে নেই, হাত পনেরো বিশ মাত্র তফাতে। ভিড়-টিড়ও কমে আসছে। মালপত্র আর ততটা ডাঁই হয়ে নেই প্ল্যাটফর্মের ওপর, এর ওর কুলি-টুলিরা মাথার ওপর তুলে নিয়েছে, হাঁটতেও শুরু করেছে, গাড়িও ছাড়ো-ছাড়ো।

চায়ের কাপটা অমৃত পায়ের তলায় নামিয়ে রাখল, মোরামের ওপর। উঠব কি উঠব না ভাব করল সামান্য, তারপর সেবতীকে বলল, 'আমি আসছি।'

টি স্টলের পাশেই সিমেন্টের বেঞ্চ। তফাতে তফাতে কৃষ্ণচূড়া; প্ল্যাটফর্ম জুড়ে আলো জ্বলছে, অন্তত এই জায়গাটায়। এখনও ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, আজ-কাল বেলা ছোট, বিকেলের গায়ে গায়ে যেন অন্ধকার নেমে আসে। সামান্য ঠাণ্ডাও পড়েছে এদিকে। পুজো কেটে গেল, আর কি; কার্তিকের মাঝামাঝি এখন।

সেবতী ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল। ক'দিন আগেও ঠাসাঠাসি ভিড় আসছিল গাড়িতে; জানলা দিয়ে মালপত্র নামাতে হত, কম্পার্টমেন্টের দরজা খোলাই যেত না, বিছানায় বাক্সয় গন্ধমাদন। কী কষ্টেই না সেবতীরা এসেছিল। ট্রেন থেকে নামার সময় সেবতীর বাঁ হাতের কনুই কার যেন লোহার ট্রাঙ্কের ধাক্কায় কেটে-ছড়ে গিয়েছিল। এখনও ব্যথা রয়েছে সামান্য। হাড়ে লেগেছিল।

সেই রকম মেলার ভিড়, হই-হট্টগোল আর নেই। তবু লোক আসছে। দেখলেই বোঝা যায় এরা চেঞ্জার, হয়তো কারও কারও ঘরবাড়ি রয়েছে এখানে। কলকাতার পয়সাওলা বাবু সব, কর্তার চেহারা, গিন্নীর দাপট, ছেলেমেয়েদের আদিখ্যেতা, ঝি-চাকরের বহর দেখলেই বোঝা মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পয়সা ঝনঝন করছে।

তা বলে সবাই কি এক হয়? সেবতীদের মতনও দু-চারজন আছে। ওই টুকুই যেন সান্ত্বনা।

ট্রেনটা আজ যেন সামান্য বেশীক্ষণ দাঁড়াল। তারপর তার হুইসল বাজল এঞ্জিনের। গাড়িটা চলতে লাগল আস্তে আস্তে, জোর হল. ছেঁড়া শালপাতা উড়ল দু-চারটে, চাঅলা, পানঅলা, মিঠাইঅলারা ফিরতে লাগল। শেষে গাড়ির আড়াল সরে গেলে ওপাশের ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম থেকে যেন সন্ধ্যের বিচিত্র গন্ধ ভেসে এল; হয়তো মাঠ গাছপালা শাকসবজির ছোট ছোট ক্ষেতের গন্ধই, এতক্ষণ যা গাড়িটার জন্যে আটকে পড়ে ছিল।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল সেবতীর। অমৃত তখনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছে। কুলি ডাকছিল হাত নেড়ে নেড়ে। সেবতী কিছুই বুঝতে পারছিল না। কে ওরা? ওই ভদ্রমহিলা, তার পাশে আরও বয়স্ক এক ভদ্রলোক। অমৃতর চেনাজানা কেউ? অফিসের লোক?

কুলিরা বাক্স, বিছানা, সুটকেশ উঠিয়ে নিল।

অমৃত ওদের নিয়ে এগিয়ে আসার মুখেই টি স্টলের কাছে গেল, দাম দিল চায়ের, বেঞ্চটা দেখিয়ে দিল ইশারায়। স্টলের বাচ্চা ছেলেটা এসে কাপ দুটো নিয়ে যাবে।

কাছাকাছি এসে সেবতীকে ডাকল, 'এস।'

সেবতী উঠল। ব্যাগ ছাড়াও হাতে ছোট পুঁটুলি মতন রয়েছে, অমৃতর রুমাল জড়ানো।

সেবতী কাছে আসতেই অমৃত ভদ্রমহিলাকে বলল, 'আমার স্ত্রী।'

ভদ্রমহিলা সেবতীর দিকে তাকালেন। ফিকে হাসির মুখ করলেন যেন. 'আচ্ছা!' চাপা, শান্ত গলার স্বর, একটু যেন দুর্বল শোনাল। চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বেগ।

ভদ্রলোক দু-চার পা পিছনে। গায়ে বুশ শার্ট, পরনে ট্রাউজার, ভাঙা গাল, চোখে পুরু কাচের চশমা। মাথায় কয়েক গুচ্ছ সাদা চুল। হাতে ছড়ি। লম্বা, রোগা রোগা দেখতে।

'কতটা রাস্তা ?' ভদ্রমহিলা অমৃতকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আধ মাইলটাক। প্রায় মিনিট পনেরো লাগবে হেঁটে যেতে।' অমৃত বলল।

'গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায় না ?'

'না। বলে রাখলে সকালের দিকে এক-আধটা প্রাইভেট রিক্‌শা পাওয়া যায়, সাইকেল রিকশা,' অমৃত বলল, 'এখানে দু-একজনের নিজেদের রিক্‌শা আছে। মালীদের আগে থেকে বলে রাখলে কখনো কখনো পাওয়া যায়।'

'আর মালী!' ভদ্রমহিলা বললেন, 'মালীর তো এই দশা। আপনি না থাকলে আমরা যে কি করতাম!' বলে পিছন দিকে তাকালেন, দাঁড়ালেন একটু, ভদ্রলোককে বললেন, 'আধ মাইল রাস্তা। তুমি হাঁটতে পারবে ?'

'পারতে হবে। উপায় কি! চল।'

ভদ্রমহিলা অমৃতর দিকে তাকালেন। 'আমি পারব। কিন্তু ওঁর কষ্ট হবে।'

অমৃতর কিছু করার ছিল না।

সেবতী চুপচাপ হাঁটছিল। এরা কারা—সে বুঝতে পারছিল না। ভদ্রমহিলাকেও তেমন কিছু সুস্থ মনে হচ্ছিল না তার। মুখ শুক্‌নো, গালের তলার দিক সরু হয়ে এসেছে, চোখ সাদাটে, কাল্‌চে রেখা পড়েছে চোখের তলায়। নাক লম্বা। গায়ের রঙ এখনও বেশ পরিষ্কার। মহিলার মাথায় কাপড় ছিল বলে সেবতী চুল বা খোঁপা দেখতে পেল না, কপালের কাছে যেটুকু দেখল তাতে মনে হল, এরও চুল সাদা হয়ে আসছে।

ওভারব্রিজের তলায় টিকিট কালেক্টারকে টিকিট দিলেন ভদ্রমহিলা, তারপর ভদ্রলোককে বললেন, 'তুমি ধীরে ধীরে ওঠ; হাঁফ লাগবে।' বলে নিজেই ভদ্রলোকের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কুলিরা এগিয়ে যাচ্ছিল বলে অমৃত টপ্‌টপ্‌ সিঁড়ি টপকে তাদের কিছু বলতে গেল।

সেবতীও উঠে এল ওপরে।

'কে গো ?' সেবতী জিজ্ঞেস করল।

'চিনতে পারলে না ?' অমৃত স্ত্রীর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল।

'না,' মাথা নাড়ল সেবতী।

'পূর্ণশশী,' অমৃত বলল ; বলে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে তাকাল। মাঝামাঝি উঠে এসেছে ওরা।

সেবতী চিনতে পারল না। কে পূর্ণশশী ? বলল, 'বুঝলাম না।'

অমৃতর যেন খেয়াল হল। বলল, 'তোমার বোঝার কথা নয়। তবু যদি নামটা শুনে থাকো—তাই বললাম। পূর্ণশশী এক সময়ে খুব নাম-করা অভিনেত্রী ছিলেন। ভেরী ফেমাস।'

সেবতী কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। সিড়ির দিকে তাকাল। পূর্ণশশীর নাম-টাম সে শোনে নি। ওই বুড়ী ছিল অভিনেত্রী ! অমৃত কেমন করে চিনল ?

'তুমি চিনলে কেমন করে ?' সেবতী বলল।

অমৃত কিছু বলতে যাচ্ছিল ; কথা পালটে বলল, 'আমি চিনব না ? বাঃ ! আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়। বছর সাতেক। আমরা যখন ছেলে-ছোকরা তুমি তখন কচি খুকি, ইজেরে দড়ি বাঁধতে।'

সেবতী আড়চোখে তাকাল ; সামান্য একটু ঠেলা দিল স্বামীর গায়ে। বলল. 'তুমি যেন এখন কতই বুড়ো হয়ে গেছ !'

অমৃত হাসির মুখ করল।

কুলি দুটো তাড়া দিচ্ছিল ; বোঝা মাথায় করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। অমৃত তাদের বোঝাচ্ছিল—'আরে ভাই, বাবু তো বিলকুল বুড্ঢা, মায়জীও বুড্ঢি, তুরান্ত চালেগি ক্যায়সা ?'

স্বামীর হিন্দী বুলি শুনে সেবতী হেসে ফেলল। 'তোমায় আর অত বোঝাতে হবে না। আমি বরং কুলিদের সঙ্গে এগোই ধীরে ধীরে। কোন্ বাড়ি বলে দাও।'

'শান্তিসদন।'

'শা-ন্তি-স-দ-ন ?'

'আমাদের বাড়ির পিছনে। ওই যে কলাগাছ, বিরাট এক বকুল...'

'ও! বুঝেছি। কাঠের ফটক, আলকাতরা মাখানো।'

'হ্যাঁ।'

সেবতী পা বাড়াল। পূর্ণশশীরা ততক্ষণে ওভারব্রিজের ওপরে উঠে এসেছেন। ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। হাঁফাচ্ছিলেন। পা ধরে গেছে বোধ হয়।

কুলি দুটো সেবতীর সঙ্গে এগিয়ে গেল। অমৃত পূর্ণশশীর কাছে এসে বলল, 'ওকে কুলির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকছি।'

পূর্ণশশী বললেন, 'বাড়ি চিনতে পারবে?'

'আমাদের পাশেই তো, বলে দিয়েছি।'

সেবতী আগেই ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে লণ্ঠন জ্বেলেছে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে বিছানায় গা এলিয়েছে অমৃত ফিরল।

সেবতী বলল, 'ঝঞ্ঝাট মিটল?'

অমৃত দরজাটা ভেজিয়ে দিল। হাওয়া আসছে। জুতো খুলতে খুলতে বলল, 'রাতটা কোন রকমে কাটাতে হবে। বাকি সব কাল সকালে।'

শান্তিসদনের মালীর বিশেষ কোন দোষ নেই। লোকটার জ্বর এসেছে দুপুর থেকে, বেশ জ্বর। কাঁপুনি রয়েছে এখনও। কলকাতা থেকে বাবুরা আসবে বলে ঘরদোর পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিল সকালেই; হঠাৎ দুপুর থেকে হু হু করে জ্বর এল। ঘোষবাবুদের বাড়িতে মালীর কোন্ 'ভাতিজা' কাজ করে, মালী তাকে স্টেশনে যেতে বলে দিয়েছিল। হয় সে যায় নি, না হয় স্টেশনে গিয়েও লোক বুঝতে পারেনি।

সেবতী বলল, 'আলোর কি ব্যবস্থা হল ?'

'মালী একটা লণ্ঠন খুঁজে দিল। ও-বাড়িতে ব্যবস্থা সবই আছে। কাল বার করে দেবে। পাশেই কে লছুয়া থাকে, তাকে কাজকর্ম করার জন্যে,বলে রেখেছিল আগেই। তাকে ডেকে দিল। সে বেটা জল-টল তুলে দিচ্ছে।'

'খাওয়া দাওয়া ?'

'কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছে বলল।'

সেবতী আর কিছু বলল না। বিছানার ওপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। এখন আর তার করার কিছু নেই। সাড়ে সাত-টাত বেজেছে হয়তো। খাওয়া-দাওয়া সারতে ন'টা বাজবে। সেবতী বিকেলের জন্যে কোন কাজ রাখে না। ত্বজন মাত্র লোক। রান্নাবান্না যা সারার সকালেই সেরে রাখে; বিকেলে বেড়াতে বেরোয়, ফেরার পথে স্টেশনের গা-লাগানো বাজার থেকে কিনে আনে কিছু, বাঙালী খাবারের দোকানে রুটি-টুটি পাওয়া যায়, মিষ্টিমণ্ডাও। কেরোসিনের স্টোভ আছে সেবতীর। খাবার টাবার গরম করে নিয়ে খেতে বসে।

সেবতীরা এসেছিল পুজোর মুখে। দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন কেটে গেল। আর মাত্র পাঁচ-সাতটা দিন। তারপর আবার কলকাতা; সেই যুগল শ্রীমানী লেন, বারো হাটের বাড়ি, একটা আট-দশ হাতের ঘর আর পায়রার খোপের মতন এক চিল্‌তে রান্নাঘরের ধোঁয়া গিলে দিন কাটানো।

'এখনও কিন্তু রোজই লোক আসছে,' সেবতী বলল, গলার স্বর সামান্য উদাস, 'এরা সবাই বেশ কিছুদিন থাকবে।'

অমৃত সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল, বিছানার একপাশে বসল। 'এখনই চেঞ্জের টাইম। শীত পড়তে শুরু করল সবে; মাস তিনেক চলবে।'

'আমরাও আর একবার এখানে শীতে বেড়াতে আসব। কি বল ?' সেবতী বলল।

কথা বলল না অমৃত। বলার কিছু নেই। বছর ছয় বিয়ে করেছে। বিয়ের পর পরই কত রকম ঘটনা ঘটল ; মা মারা গেল, সেবতীর বাবা বর্ধমান থেকে কলকাতায় আসতেন পেনসনের টাকা নিতে, রাস্তার মধ্যে মাথার শিরা ছিঁড়ে মরলেন, হাসপাতালের মর্গ থেকে তাঁকে বার করতে হল খুঁজে খুঁজে। পর পর দুটো ধাক্কা সামলাতে সময় লাগল অমৃতর।

যখন খানিকটা সামলে নিয়েছে, সেবতী আবার এক গণ্ডগোল পাকাল। সাত না আট মাসে তার বাচ্চা নষ্ট হল। যমজ বাচ্চা! বাড়ি আর হাসপাতাল করেছে ক'টা দিন। তখন থেকেই সেবতীর শরীর স্বাস্থ্য মন ভেঙে গেল। গায়ের রঙ দিন দিন ফ্যাকাশে খড়ির মতন হয়ে উঠল, কালি ধরল চোখের তলায়, আজ মাথা ঘোরে, কাল জ্বর আসে, বুক ধড়ফড় করে। এরই সঙ্গে সঙ্গে নানা বাতিক। বউকে নিয়ে অমৃত বড় মুশকিলে পড়েছিল। ডাক্তার পালটে পালটে শেষে সত্য—তার বন্ধুর মামাকে গিয়ে ধরল। তিনিই শেষ পর্যন্ত বাঁচালেন সেবতীকে। অমৃতও নিঃশ্বাস ফেলল স্বস্তির।

সেবতী এখন ভাল। নিজের হতাশা, দুঃখ, মনোক্লেশের সঙ্গে যুঝে উঠতে পেরেছে। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তার। সেবতীরই খুব শখ হয়েছিল, দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসার। সত্যর মামা—ডাক্তারবাবুও বলেছিলেন, 'একটু জল-বাতাস পালটে এস, অমৃত। ভাল লাগবে।'

বউ নিয়ে ঘোরাফেরা হয়ে ওঠে নি অমৃতর। একবার দিন দুয়েকের জন্যে দীঘায় গিয়েছিল। তখন ভিড়ের সময়। কষ্ট ছাড়া আর কিছু জোটে নি বরাতে। অমৃত কোথায় যাই যাই করছিল, অফিসের বন্ধু অমল তাকে এই ঘর বাড়ি ঠিক করে দিল। তার ভায়রাদের বাড়ি, বেচে-টেচে দেবে। বাড়ি ঠিক করে অমল বলল, 'চলে যা অমৃত, জায়গা ভাল ; বাড়িটা তেমন একটা ভাল নয়, তবে তোদের দুজনের চলে যাবে। ভাড়া-ফাড়া লাগবে না তোর।'

সেবতীও নেচে উঠল। 'চল না, সুবিধে যখন রয়েছে।'

কোন সন্দেহ নেই, অমৃত এখানে এসে খুশী হয়েছে। তার বলার কিছু নেই। এমন কি এই পোড়ো বাড়িটার বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই তার। দুজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। জানলা দরজার অবস্থা যেমনই হোক, গোটা দুই ঘর, রান্নার জায়গা, কলতলা, কুয়ো, একটু বারান্দা, মায় তক্তপোশ আর একটা ভাঙা টেবিল—এ কি সহজে পাওয়া যায়।

বেশ আরামে খেয়ে-দেয়ে, ঘোরাঘুরি করে, সেবতীকে কখনও খেপিয়ে দিয়ে, কখনও তার একান্ত অনুগত বাধ্য স্বামী হয়ে চমৎকার কাটিয়ে দেওয়া গেল দিনগুলো। সেবতীরও উপকার হয়েছে শরীরের। গায়ের রঙ একটু-আধটু কাল্চে হয়ে গেলেও চোখে-মুখে চমৎকার সজীব ভাব এসেছে। কেমন তরতরে ঝরঝরে হয়ে উঠেছে সেবতী।

কিন্তু একবার আসতে পারল বলে কি বারবার পারবে? তেমন অবস্থা অমৃতর নয়। হয়তো কপালে থাকলে হতে পারত; কিন্তু হয় নি।

সিগারেটটা শেষ করে অমৃত উঠল। বলল, 'দাঁড়াও, হাতমুখ ধুয়ে এসে বসি। শীতটা কিন্তু এইবার পড়ছে।'

সেবতী বলল, 'পড়ুক। আমরা তো আরও পাঁচ-ছ' দিন রয়েছি। শীত একটু খেয়ে নিয়ে যাব।' এমন করে বলল যেন শীত সত্যিই খাবার জিনিস। ছেলেমানুষের মতন শীত খাবে সেবতী।

অমৃত জামা-টামা ছাড়তে লাগল।

দুই

সেবতী শুয়ে শুয়ে সিনেমার একটা মোটাসোটা কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, মেটে ঝাপসা আলোয় এই কাগজের কিছুই ঠিক পড়া যায় না, বড় জোর ছবিগুলো দেখা যায়।

অমৃত এসে পাশে বসল। পরনে পাজামা, গায়ে চটকানো পাঞ্জাবি, খদ্দরের। বউকে ঠেলে সরিয়ে দিল অমৃত, রগড় করে বলল, 'পনেরো

দিনেই অর্ধেকের বেশী জায়গা নিয়ে নিচ্ছ! যাবার সময় তোমাকে লাগেজ ভ্যানে তুলতে হবে।'

সেবতী যেন কতই বিরক্ত এমন একটা শব্দ করে পাশে সরে গেল। বলল, 'তুমি আমায় খুঁড়ছ?'

'আজ কি বার?'

'কেন! বুধবার।'

'কিস্সু হবে না।' অমৃত দুষ্টুমি করে তার একটা পা স্ত্রীর পায়ের ওপর চাপিয়ে দিল।

সেবতী আরও ক'টা পাতা উল্টে কাগজ বন্ধ করল। তারপর হঠাৎ বলল, 'ওই মহিলা—কি নাম বললে—পূর্ণশশী—ওঁর বয়েস কত হবে গো?'

অমৃত যেন শোনে নি, অন্য কিছু ভাবছিল, চুপ করে থাকল।

সেবতী আবার বলল, 'এই, বলছ না?'

অমৃত বলল, 'দাঁড়াও হিসেব করি। মেয়েদের বয়েস, তার ওপর অভিনেত্রী···ডিফিকাল্ট ব্যাপার।' বলে সামান্য চুপ করে থেকে শেষে বলল, 'পঞ্চান্নর কম নয়।'

ঠাট্টার গলায় সেবতী বলল, 'ষাটের বেশীও হতে পারে।'

'না না, ষাট নয়। ষাট হতে পারে না। ভদ্রলোককে তুমি পঁয়ষট্টি বলতে পারো।'

'ভদ্রলোক ওঁর কে?'

অমৃত ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'বলতে পারছি না।'

'স্বামী?'

'হতেও পারে। না-ও পারে। ভদ্রলোকের নাম শরৎ লাহিড়ি।'

'তোমায় বলল?'

'না। কালো ট্রাঙ্কের ওপর লেখা ছিল।'

সেবতী হাতের চুড়িতে সেফটিপিন খুঁজল, পেল না। জামা থেকে খুলে নিল। নিয়ে কান চুলকোতে লাগল। বলল, 'তা তোমার পূর্ণশশী কিসের পার্ট-টার্ট করত?'

অমৃত ছাদের দিকেই তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারই একরকম। লণ্ঠনের আলো ওপরে পৌঁছচ্ছে না।

সেবতী নিজেই বলল, 'চেহারার আড় ভাল। মাথায় বেশ লম্বা। শাড়িটা টাঙাইল।'

'এক সময় দেখতে খুব ভাল ছিলেন।'

'বোঝাই যায়।'

'লেখাপড়াও জানতেন। শুনতাম বি. এ পর্যন্ত পড়েছেন।··· তখনকার দিনে ওই লাইনে পড়াশোনা করা মেয়ে-টেয়ে বড় একটা আসত না।'

সেফটিপিনটা হাতের চুড়িতে আটকে রাখল সেবতী। স্বামীর পা সরিয়ে পাশ ফিরল। অমৃতর দিকে মুখ করে বলল, 'তুমি এত খবর রাখলে কেমন করে?'

অমৃত সোজা হয়ে শুয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, 'বাঃ, না জানার কি রয়েছে। আমরা তখন থিয়েটার-টিয়েটার দেখতাম। দু-একটা চটি চটি কি সব কাগজও ছিল। তাতে পড়তাম। তুমি ভাবছ, যা কিছু আজকালই হচ্ছে। ওই গব্বামার্কা কাগজগুলোই সব।'

সেবতী হেসে ফেলল। স্বামীকে নিজের দিকে টানল; মুখ ফেরাতে বলল।

পাশ ফিরে শুলো অমৃত। সেবতীর মুখোমুখি। সেবতীর মুখ ছোট, চাপা ধরনের, সরু নাক, পাতলা ঠোঁট, ছোট ছোট চোখ, নরম ধরনের। স্টেশনে শখ করে পান খেয়েছিল, ঠোঁটের ডগায় এখনও পানের লাল লেগে আছে।

অমৃতর গায়ে হাত তুলে দিয়ে সেবতী বলল, 'তুমি নিজে পড়াশোনা না করে ওই সবই করতে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'থিয়েটার-সিনেমা দেখে বেড়াতে?'

'দেখতাম। কেন?'

'মন দিয়ে পড়াশোনা করলে কাজে আসত,' সেবতী তামাশার গলায় বলল, 'ছেলেবেলা থেকেই বকে গেলে—তাতে আর কি হবে!'

অমৃত যেন অসন্তুষ্ট হল। বলল, 'যা হয়েছে তাতে তোমার পোষাচ্ছে না নাকি? তা তোমার বাবাকে বললে পারতে, কাজে-আসা ছেলে যোগাড় করে দিত।'

সেবতী বুঝতেই পারে নি, সামান্য কথায় স্বামী হঠাৎ চটে যাবে। অপ্রস্তুত বোধ করল। বলল, 'আহা, কি কথার কি জবাব! আমি কি তোমায় খারাপ কিছু বলেছি। সত্যি, তুমি যেন কী!'

অমৃত জবাব দিল না কথার। ঠিক বুঝতে পারছে না, কিন্তু কেমন যেন বিরক্ত লাগছিল। কেন?

সেবতী স্বামীর হাত টেনে নিল। আঙুল টানল। নিজের গালের ওপর রাখল একটু। তারপর বুকের ওপর আল্‌তো করে রেখে বলল, 'বাবুর কি রাগ হল? মাফ চাইছি।'

অমৃত স্ত্রীর নাকের পাশে বড় আঁচিল লক্ষ করতে করতে যেন নিজের বিরক্তিকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। 'রাগ করব কেন! রাগ করলে নিজেরই ক্ষতি।'

'কেন?'

অমৃত সেবতীর বুকের ওপর আল্‌তো করে চিমটি কাটল। হাসল। বলল, 'ক্ষতি নয়, আরেব্বাস, ভীষণ ক্ষতি। সারা নিশি আছে পড়ি যেমতি বসন থাকে সুবেশা নারীর...' বলতে বলতে অমৃত তার স্ত্রীর বুকের কাপড় সরিয়ে দিল।

স্বামীর হাতের ওপর শাসন করার ভঙ্গিতে ছোট করে চড় মারল সেবতী। কাপড় টেনে নিল বুকের ওপর মুঠো করে। 'হচ্ছে কি?'

অমৃত হাসল। 'কিচ্ছু না। ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিলাম। মেয়েদের বসন তো কম নয়, তাও আবার বাহারী! সেই রকম এক নিশি পড়ে রয়েছে, ভাই।' বলে অমৃত বউয়ের গালে টোকা মারল।

বুকের কাছে হাত রেখেই সেবতী বলল, 'পদ্য আওড়াচ্ছ?'

'আগে থিয়েটারে এইভাবে পদ্য বলত।'

'থিয়েটারের মেয়ে দেখে তোমায় বুঝি থিয়েটারে পেয়েছে ?'

অমৃত জবাব দিল না কথার। সেবতীর গালে আঙুল বোলাতে লাগল নরম করে। বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমার মধ্যে থিয়েটারের রক্ত আছে, জানো ? আমার বাবা গান লিখত থিয়েটারের, নাটকও লিখেছে।'

স্বামীর গলার স্বরের গাঢ়তা কানে লাগল সেবতীর। দেখছিল স্বামীকে। কাটা কাটা ছাঁদের মুখ, নাক একটু মোটা, শক্ত থুতনি, বড় বড় চোখ। গায়ের রঙ অবশ্য কালো। পুরুষ মানুষের এই রকম চেহারাই পছন্দ সেবতীর। মেয়েলী নয়, অথচ মোলায়েম। বড় বড় দু' চোখে কেমন একটা টান আছে অমৃতর।

সেবতী বলল, 'শ্বশুরমশাই তো চাকরি করতেন শুনেছি।'

অমৃত বলল, 'বাবা তখনকার দিনে সাহেব কোম্পানীতে চাকরি করত। গিবসন অ্যাণ্ড জেম্‌স। কোস্টলাইন স্টীমার সার্ভিস ছিল কোম্পানীর। দেদার পয়সা লুঠত। বাবাও কি কম ছিল! শৌখিন, পয়সা ওড়াত দু' হাতে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। আর ওই থিয়েটার। গান লিখত। দু-চারটে প্লে লিখেছে। সে সব আর পাওয়া যায় না। শালারা মেরে দিয়েছে।

সেবতী শ্বশুরমশাইয়ের কথা বেশী জানে না। শাশুড়ী তেমন কিছু বলতেন না স্বামী সম্পর্কে। এইটুকু মাত্র সে শুনেছে, শ্বশুরমশাইয়ের জীবিত কালে অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল, বাদুড়বাগানে থাকতেন সব, শাশুড়ীকে কোনদিন কোমর নুইয়ে একটা কুটোও দু' টুকরো করতে হয় নি। শ্বশুরমশাই একদিন হুট করে মারা গেলেন। মাথায় যেন বাজ পড়ল।

অমৃতের বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরোও হয় নি। কর্তা যতদিন ছিলেন, আত্মীয়জনের অভাব হয় নি ; তিনি গেলেন আর মধুও ফুরলো। কেউ এসে দাঁড়াল না পাশে। ধার-দেনা, মর্টগেজ সব হুড়মুড় করে মাথায় এসে পড়ল। শাশুড়ী ডুবন্ত অবস্থায় শুধু ছেলেকে সম্বল করে ভাসতে লাগলেন।

সেবতী এ-সব কথা কিছু কিছু শুনেছে। আরও হয়তো শুনত যদি শাশুড়ী বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তিনিও তো তারপর বেশীদিন থাকলেন না।

তবু সেবতী লক্ষ করেছিল, শাশুড়ী যেন শ্বশুরমশাইয়ের কথা বেশী বলতে চাইতেন না। বিলাপ করতেন না স্বামীর জন্যে ; বরং নিজের কষ্ট এবং কৃতিত্বের কথাই বলার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর।

সেবতী বলল, 'বাবা, থিয়েটারের বই-টই লিখতেন তুমি তো বল নি ?'

'বলেছি এক-আধবার, তুমি হয়তো খেয়াল করে শোন নি। কেন আমি বলি নি, ওই যে গানটা—"সে যে নিঠুর অতি, তবু কেন মন বোঝে না, চাতক হয়েছি আমি…"

সেবতী শুনছিল। ভাল লাগছিল। বলল, 'গাও না।'

'কি হবে! বাবার সবই তো শালারা মেরে দিয়েছে।'

স্বামীর গলার কাছে হাত রাখল সেবতী। 'তোমায় কিছু বললেই না বল কেন ?'

'না বলছি কোথায়! আমি কি গান গাইতে পারি ?'

'পারো না! সারাদিন কত রকম গান গাইছ!'

'দূর! ও সব তোমাদের ফিল্মমার্কা গান।'

শীত লাগল সেবতীর। সিরসির করে উঠল হাত-পা। দরজার ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে।

'ক'টা বাজল গো ?' সেবতী জিজ্ঞেস করল।

'সাড়ে আটটা হবে।'

'তা হলে উঠি।'

'ন'টা বাজুক।'

'আমার শীত করছে। ওই ভুট কম্বলটা আনবে ?'

আরও একটু শুয়ে থেকে অমৃত উঠল। ঘরের কোণার দিকে একটা টুল। তার ওপর বাক্স। কম্বল-টম্বল তারই ওপর পাট করে রাখা ছিল।

কম্বল এনে সেবতীর গায়ের ওপর বিছিয়ে দিল অমৃত। নিজে শুলো না। প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল।

সেবতী বলল, 'তুমি শোবে না ?'

'একটু বাইরে দাঁড়াই।'

'বাইরে ঠাণ্ডা। দরজা খুললে হু-হু করে বাতাস আসবে।'

'বাইরে থেকে আমি ভেজিয়ে দেব। তুমি শোও।'

অমৃত বাইরে চলে গেল। গিয়ে দরজা টেনে দিল বারান্দা থেকে।

তিন

পরের দিন সকালে অমৃত আর সেবতী স্টেশনের বাজার থেকে ফিরে এসে একবার শান্তিসদনে গেল খোঁজ খবর করতে।

অমৃতর হাতে প্লাস্টিকের ঝুড়ি। আলু, বেগুন, পিঁয়াজ, ছোট মতন একটা ফুলকপি, শালপাতায় জড়ানো দু-চার টুকরো মাছ। সেবতীর হাতে কিছু মশলাপাতি, এক টিন কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক। শান্তিসদনের পাশের ফাঁকা জায়গাটুকুতে শাড়ি-টাড়ি শুকোচ্ছে পূর্ণশশীর। লছুয়া কয়লা কাঠ-টাট যোগাড় করে এনেছে। তার বউ কুয়োতলায় কাজ সারছিল।

বাইরেই ছিলেন পূর্ণশশী। মাথায় কাপড় নেই। সাদা খোলের শাড়ি, কালো পাড়। পায়ে চটি।

একটা সাদামাটা কাঠের চেয়ারে শরৎবাবু বসে। গায়ে চাদর। পরনে পাজামা।

পূর্ণশশী মিষ্টি করে হাসলেন। 'বাজার যাওয়া হয়েছিল ?'

অমৃত হাসিমুখ করল। 'কাল আপনাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে।'

'একটু তো হবেই। নতুন জায়গা। কোন্ গোছগাছ নেই।'

সেবতী দিনের আলোয় পূর্ণশশীকে ভাল করে দেখছিল। মুখে বয়েসের ছাপ। চামড়া কুঁচকে আসছে, মসৃণতা নেই। দাঁতের তলায় ছোপ ধরেছে। মাথার চুল ছোট ছোট, ঘাড় পর্যন্ত। কোঁকড়ানো। অনেক চুল সাদা হয়ে এসেছে।

শরৎবাবু খানিকটা নির্জীবের মতন বসে। রাত্রে বোধ হয় ঘুম হয় নি। অবসাদ রয়েছে। গাল চোপসানো। চোখে চশমা। হাতে চুরুট। অমৃতদের দেখছিলেন, কিন্তু চুপ করে ছিলেন।

অমৃত পূর্ণশশীকে বলল, 'আপনাদের হাটবাজার ?'

'মালীই যাবে বলছিল। ওর জ্বর কমেছে। বাজারে নাকি কোন্ কবিরাজ আছে, তার ওষুধ নিয়ে আসবে। বাজারটাও করে আনবে।'

'পারবে ?'

'ওই যে কি নাম—লছু—ওকে সঙ্গে দেন।'

সেবতীর হঠাৎ কি মনে হল, বলল, 'আপনাদের রান্নাবান্না ?'

'কেন ?'

'কে করবে ?'

পূর্ণশশী যেন অবাক হয়ে তাকালেন, তারপর বুঝতে পেরে হেসে ফেললেন। 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ?'

সেবতী অপ্রস্তুত।

অমৃত হেসে ফেলে বলল, 'ঠিক। রান্না আর এমন কি হাতি ঘোড়া, বলুন !'

পূর্ণশশী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অমৃতরা চলে আসছিল। 'আমরা যাই। পরে দেখা করব।'

শরৎবাবু হঠাৎ বললেন, 'এখানে রান্না করার ঠাকুর পাওয়া যায় না একটা ?'

'জানি না। অনেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এখানে ঠিক রান্না করার ঠাকুর…'

অমৃতকে থামিয়ে দিয়ে পূর্ণশশী বললেন, 'এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। পরে দেখা যাবে।' বলে শরৎবাবুর দিকে তাকালেন।

ফিরে আসার সময় সেবতী বলল, 'বাব্বা, তোমার পূর্ণশশীর মুখ আছে।'

অমৃত হাসল। 'তা থাকবে না, ওই মুখের কম কদর ছিল।'

'আমি সে-মুখের কথা বলছি না। কথার কায়দা দেখেছ! কাটা কাটা কথা।'

'তা থাকবে। কথা বলেই তো খেতে হত এককালে।'

সামনেই আতা ঝোপ। হাত কয়েক পাশে ভাঙাচোরা তারের বেড়ায় লতার জঙ্গল। ফুল ফুটেছে অজস্র। পায়ের সামনে দিয়ে গিরগিটি ছুটে গেল, হাত খানেক লম্বা। একটা দেবদারু গাছ একা একা দাঁড়িয়ে আছে। দু-চারটে পাখি কোথাও ডাকাডাকি করছিল।

বাড়িতে পৌঁছে অমৃত দরজার তালা খুলল।

সকালে সময় হয় না। কোন রকমে একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে দুজনে। বেড়াতে বেড়াতে সেই কুষ্ঠাশ্রমের কাছাকাছি চলে যায়। তারপর ফেরে। হাটবাজার সেরে নেয়, জলখাবারের পাটও চুকিয়ে ফেলে বাজারে। বাড়ি ফেরে। বাড়ির মধ্যে তখন সব লণ্ডভণ্ড। বিছানাপত্র এলোমেলো। মশারি ঝুলছে। জানলাগুলো বন্ধ। রাত্রের এঁটোকাঁটা পড়ে রয়েছে পাশের ঘরে।

বাড়ি ফিরে সেবতীর অনেক কাজ। অমৃতও সাহায্য করে; জানলাগুলো খুলে দেয়, মশারির দড়ি খোলে। দু-এক বালতি জল তুলে দেয় কুয়ো থেকে।

খানিকটা পরে দমবন্ধ ঝাপসা বাড়ির ভেতরটা সকালের রোদে, বাতাসে, সেবতীর গলার শব্দে, কাজেকর্মে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

চা করেছিল সেবতী। চা দিয়ে রান্নাবান্না নিয়ে বসবে।

'কাল রাত্তিরে অতটা বুঝি নি,' সেবতী বলল, 'আজ সকালে যা চেহারা দেখলুম, ও তো বুড়ী গো!'

'পূর্ণশশী?'

'এখনও বুড়ী সাজগোজ করে নাকি?'

'দেখলে?'

'এখন দেখলাম না। সিঁদুর-টিঁদুরও ছিল না কোথাও। হাতে সরু সরু দু' গাছা করে চুড়ি।'

'আমি অতটা লক্ষ করি নি।'

'তা হলে ওই বুড়োটা কে? স্বামী তো নয়ই।'

অমৃত স্ত্রীকে লক্ষ করল। সেবতীর চোখে-মুখে কেমন যেন ধোঁকা-খাওয়া ভাব। হেসে ফেলে বলল, 'এক কাজ কর না। আজ সন্ধ্যেবেলায় একবার যাব। তখন তুমি খুব ন্যাকার মতন একবার জিজ্ঞেস করে ফেল—উনি আপনার কে?'

'যাঃ,' সেবতী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাই কি জিজ্ঞেস করা যায়?'

অমৃত আর কিছু বলল না।

দুপুরে দুজনেই খানিকক্ষণ গা গড়িয়ে নেয়। ঘুমোতে চায় না. ঘুমোলেই শরীর বেজুত হয়ে ওঠে. চোখ-মুখ ফুলে যায়, গলা ব্যথা করে সেবতীর। কুয়োর জলে স্নান এখনও তার সহ্যে এল না। একটু গা গড়িয়ে নিয়ে সেবতী, সিনেমার কাগজ ওলটায়, অমৃত বাসী কাগজ পড়ে। নয়তো দুজনেই বসে যায় তাস খেলতে। নিয়মকানুন নিজেদেরই তৈরী করা।

তাস খেলতে খেলতেই আবার পূর্ণশশীর কথা উঠল।

সেবতী উপুড় হয়ে শুয়ে তাস খেলছিল, অমৃত একপাশ হয়ে শুয়ে। একটু আগে লছুয়া এসেছিল একটা খাম কিংবা পোস্টকার্ড চাইতে, ও-বাড়ি থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে।

অমৃতর কাছে পোস্টকার্ড ছিল। দিয়ে দিল।

সেবতীই কথা তুলল। 'কোন্ থিয়েটারে ছিল গো তোমার পূর্ণশশী?'

'সব থিয়েটারে।'

'সব থিয়েটারে?'

'থিয়েটার পালটাত। যে বেশী টাকা দিত, খাতির দেখাত, ভাল ভাল পার্ট দিত—চলে যেত।'

'কিসের পার্ট করত? ··এই ওটা আমার পিঠ; হাত সরাও। রানী-টানীর পার্ট?'

'তা করেছে,' অমৃত বলল, 'হিস্টোরিক্যাল হলে রানীর পার্ট তো করবেই। একবার "কপালকুণ্ডলা" নামিয়েছিল কারা, মতিবিবি সেজে-ছিল। দারুণ করেছিল।'

'তুমি দেখেছ?'

'না, শুনেছি।···আমি ওর একটা সোস্যাল ড্রামাও দেখেছি। সাংঘাতিক করত। বইটা যেন কি, পরিশোধ না পরিণাম। তাতে শেষে পাগল হয়ে যাওয়া ছিল। পাগল হয়ে যাবার পর স্বামী হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে—বউ যাবে না। একটা ডল পুতুল কোলে নিয়ে গান গাইছে···' বলতে বলতে থেমে গেল অমৃত। স্ত্রীর দিকে তাকাল। সচেতন হয়ে উঠল হঠাৎ। কথা পালটে নিয়ে বলল, 'তখন এই রকম সেন্টিমেণ্টাল নাটক হত। আমাদেরও বয়েস কম ছিল। ভাল লাগত।'

সেবতী মুখ না তুলেই বলল, 'আমি পাগল হয়ে গেলে তুমি কি করবে?'

অমৃত হাসবার চেষ্টা করল। 'তুমি পাগল হবে কেন?'

'মানুষ পাগল হতেই পারে।'

'তুমি হবে না। আমি হতে দেব না।' বলে অমৃত স্ত্রীর মাথা ধরে নেড়ে দিল। সিগারেট ধরিয়ে নিল একটা। কথাটা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'পূর্ণশশী তখন দু-চারটে সিনেমাতেও নেমেছিল। পরে আর নামত না। সুবিধে করতে পারে নি বোধ হয়।'

সেবতী তাস গুটিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি দেখছি, অনেক জানো। তোমার পূর্ণশশীকে বলো, খুশী হবে।'

সন্ধ্যেবেলায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে সেবতী নিজেই বলল, 'চল, তোমার পূর্ণশশীর ওখান থেকে ঘুরে যাই।'

অমৃত বলল, 'তুমি বার বার আমার পূর্ণশশী বল কেন?'

'কি হয়েছে বললে। তোমারই তো। তুমিই শুধু ওকে জানো।'

'জানে অনেকেই। জানত। এখানে আর কে জানবে আমি ছাড়া।' বলে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিল। হাঁটতে লাগল। সামান্য জ্যোৎস্না। আলো ফুটছে না। রেললাইনে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার ডিজেল এঞ্জিনে শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা এখান থেকেও শোনা যায়। যেন চারপাশের বাতাসে কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ ছড়িয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে অমৃত বলল, 'এ-সব লাইনে এটাই হয়। একদিন সবাই চেনে, সবাই ছোটে, গদগদ হয়—তারপর আর কেউ তাকে পোঁছে না।'

সেবতী চুপচাপই থাকল। অমৃত যেন বিরক্ত হয়ে রয়েছে। খুবই আশ্চর্য, স্বামী কাল থেকেই যেন কেমন বিরক্ত হয়ে উঠছে, আবার সামলে নিচ্ছে। 'তোমার পূর্ণশশী' কথায় বিরক্ত হবার কি ছিল! সেবতী কিছু মনে করে বলে নি, ঠাট্টা করেই বলেছে।

বাড়ির কাছে এসে সেবতী বলল, 'থাক, আমি না হয় না গেলাম। তুমিই ঘুরে এস।'

'কেন?' অমৃত বলল।

'অনেক হেঁটেছি। আমার আর ভাল লাগছে না।'

'বাড়িতে একলা থাকবে! চল। তাড়াতাড়ি চলে আসব।'

সেবতী আর আপত্তি করল না।

পূর্ণশশীর বাড়ির সামনের দিকটা বাংলোর মতন। খোলা বারান্দায় কেউ ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় পা দিতেই মাঝের ঘর থেকে গলা শোনা গেল পূর্ণশশীর।

অমৃত শব্দ করে কাশল। পূর্ণশশী দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন: 'ও! আপনারা!···আসুন।'

অমৃত আর সেবতী ঘরে এল। যাঁর বাড়ি তাঁরই কিছু আসবাবপত্র দিয়ে মাঝের ঘর সাজানো। বেতের সোফা, কাঠের চেয়ার, সাদামাটা দেওয়াল-শেল্‌ফে পুরোনো বইপত্র, টুকিটাকি, দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের বড় ছবি, দু-একটা ফটো-টটো। বাতি জ্বলছিল একপাশে। কাচের টেব্‌ল ল্যাম্প।

অমৃত বলল 'আপনাদের সবকিছু মোটমুটি গোছানো হয়ে গেছে দেখছি।'

বসতে বললেন পূর্ণশশী। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি। সাদা জমি যেন মাড়ে ফুলে আছে। চুল বেঁধেছেন খোঁপা করে, মাথায় কাপড় নেই। ছোট হাতার জামা গায়ে।

অমৃত বসল। সেবতীও।

পূর্ণশশী বললেন, 'বিকেলের বেড়ানো হল?'

'হ্যাঁ' অমৃত হেসে বলল, 'এক ঢিলে দুই পাখি। বেড়ানোও হয়, একটু পেটের ব্যবস্থাও করে আসি।'

'স্টেশনে গিয়েছিলেন?'

'রোজই যাই প্রায়। সবাই যায়। কলকাতার লোক; মানুষজনের মুখ না দেখলে পেটের ভাত হজম হয় না।' অমৃত হালকা আলাপী সুরে কথা বলছিল।

সেবতী দেখছিল পূর্ণশশীকে আড়চোখে। ফিটফাট পরিষ্কার দেখাচ্ছে। বুড়ী কি বিকেলে স্নো পাউডার মাখে?

'আপনারা খুব ভাল সময়ে এসেছেন,' অমৃত বলল, 'এখন থেকেই সিজ্‌ন। শীত পড়তে শুরু করেছে। এই সময় জল আরও ভাল হয়, বর্ষার পর পর ঠিক ততটা ভাল থাকে না। এখানকার লোকই বলে, এই দু-তিন মাস সবচেয়ে ভাল ক্লাইমেট। তাছাড়া, এ সময়ে খাবার-দাবারও পাওয়া যায়। টাটকা শাক-সবজি।'

পূর্ণশশী ঘাড়-পিঠ সোজা করে বসে ছিলেন। বললেন, 'সেই সব শুনেই আসা।'

'কতদিন থাকবেন?'

'দেখি। মাস দেড়-দুই তো থাকার ইচ্ছে ছিল। তবে সুবিধে-অসুবিধে দেখে কতদিন থাকতে পারব জানি না।...আপনারা তো চলে যাচ্ছেন।'

অমৃত সঙ্কোচের গলায় বলল, 'আমাদের আপনি আপনি করছেন কেন, বয়েসে আপনি অনেক বড়।'

পূর্ণশশী দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন অমৃতর দিকে। হাসলেন একটু। 'আমারও কেমন লাগে বলতে। তুমিই বলব।'

'আমরা আর দিন ছয় আছি। ছুটি নিয়েছিলাম দিন কুড়ির। ফুরিয়ে এল।'

পূর্ণশশী সেবতীর দিকে চোখ ফেরালেন। 'তোমার কেমন লাগল এখানে?'

'ভাল।'

'এখানেই বসে থাকলে, না, কাছাকাছি বেড়ালে ক'দিন?'

'না; এখানেই ছিলাম। যাবার আগে সীতাকুণ্ড দেখতে যাব।'

'সেটা কোথায়?'

'দূর রয়েছে। বাসে যেতে হয়।'

অমৃত বুঝিয়ে বলল, 'কিছু নয়; হটওয়াটার স্প্রিং...লোকে চান-টান করে, বাতের ব্যথা সারায়—' বলে হাসল।

সাধারণ এলোমেলো আরও ক'টা কথা হল।

পূর্ণশশীর খেয়াল হল যেন, বললেন, 'চা করি একটু, খাও।'

অমৃত মাথা নাড়ল। 'না না, আবার চা কেন! আমরা এইমাত্র স্টেশন থেকে খেয়ে আসছি।'

'তা হোক, আর একটু খেলে কি হয়েছে!' বলে পূর্ণশশী উঠে দাঁড়ালেন। 'আমরা একটা লোক পেয়েছি, লছুই যোগাড় করে দিল। ডাকবাংলোয় কাজ করে। বলেছে সকালে বিকেলে আসবে। রয়েছে লোকটা। ওকে বলছি।'

পূর্ণশশী ভেতরে গেলেন। সেবতী ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। অমৃত উঠে গিয়ে পুরোনো বইয়ের শেল্ফটা দেখছিল। এই আলোয় কিছু

পড়া যায় না। রীতিমত কষ্ট করে দু-চারটে বইয়ের নাম দেখল। ঘাঁটল একটু। কয়েক খণ্ড লণ্ডন মিস্ট্রি, তার পাশেই ভালমত পুরোনো পাঁজি, কিছু বাঁধানো মাসিক পত্রিকা। বিচিত্র এক বই, নাম ঃ 'মৃতের সহিত কথোপকথন।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ডাক এল পূর্ণশশীর, 'শশী—শশী।' শরৎবাবুর গলা। তিনি ডাকছেন।

পূর্ণশশী ঘরে নেই। অমৃত দরজার দিকে তাকাল, যেন অপেক্ষা করছিল পূর্ণশশীর।

শরৎবাবু মাঝের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। চোখে চশমা নেই। দেখতেও পাচ্ছেন না যেন। 'শশী, আমার ওষুধ?'

অমৃত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পূর্ণশশী ঘরে এলেন। দেখলেন শরৎবাবুকে।

'ডাকছিলে?'

'আমার ওষুধ?'

পূর্ণশশী যেন একবার অমৃত আর সেবতীকে লক্ষ করে নিলেন। 'তুমি ঘরে যাও, একটু পরে দিচ্ছি।'

শরৎবাবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে গেলেন।

সেবতী হঠাৎ বলল, 'ওঁর কিসের অসুখ?'

পূর্ণশশী অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'হাজার রকমের। বয়েস হয়েছে; বয়েস হলে মানুষের কোন্ রোগ আর না হয়।'

অমৃত পূর্ণশশীকে দেখছিল। ঠাণ্ডা, শান্ত, নিস্পৃহ গলার স্বর; মুখের সমস্ত রেখা স্থির হয়ে আছে; চোখ কেমন যেন উদাসীন। কোন কারণ ছিল না, অন্তত অমৃত কোন কারণ খুঁজে পেল না, আচমকা বলল, 'আমি একটা বই নেব ওই শেল্ফ থেকে? পড়ে দু-এক দিনের মধ্যেই ফেরত দেব?'

'বই?' পূর্ণশশী মুখ ফেরালেন। তাকালেন শেল্ফের দিকে। 'নাও।'

অমৃত আগেই বইটা বার করে নিয়েছিল। দেখাল একবার।

চার

পরের দিন নয়, তারও পরের দিন একটু রাত করে অমৃত শান্তি-সদনের দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

প্রথমে সাড়াশব্দ পেল না। দরজায় ধাক্কা দিল সামান্য।

দরজা খুলে দিলেন পূর্ণশশী। 'তুমি?'

'বইটা দিতে এলাম।' অমৃত বলল।

'বই!...ও আচ্ছা, তা পরে দিলেই পারতে।'

পূর্ণশশী দরজা থেকে সরে যাচ্ছেন না; দাঁড়িয়ে আছেন; যেন এখান থেকেই বিদায় করে দিতে চান অমৃতকে।

অমৃত বলল, 'এখনও তেমন রাত হয় নি বলে এলাম। আটটা বোধ হয়। আপনারা কি শুয়ে পড়েছেন?'

'না না, এখনই শুয়ে পড়ব কি!' বলে পূর্ণশশী বোধ হয় অপ্রস্তুত বোধ করেই সরে গেলেন দরজা থেকে। 'এস।'

অমৃত ভেতরে এল। মাঝের ঘরের একপাশে আলো জ্বলছিল মিটমিট করে। পূর্ণশশী নিজেই আলোর সল্‌তে বাড়িয়ে দিলেন। 'আজ সারাদিন তোমাদের দেখলাম না।'

বসল অমৃত। বইটা তার হাতে। গতকাল সকালে অমৃত খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল পূর্ণশশীর, সন্ধ্যেবেলায় আর আসে নি। আর সকালেও নয়। রাত্রে এসেছে। 'সকালে একটা ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম। আপনি বসুন।'

পূর্ণশশী বসলেন। হাত কয়েক তফাতে; অমৃত মুখোমুখি।

জোরে জোরে না হলেও অমৃত টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিল। ঘরে ঢোকার সময় থেকেই গন্ধটা পাচ্ছে অমৃত। অচেনা গন্ধ নয়। পূর্ণশশীকে লক্ষ করল। চোখে-মুখে কোন চিহ্ন নেই, কথাও স্পষ্ট। গায়ে শাল রয়েছে পূর্ণশশীর, পাতলা শাল। মাথায় কাপড় নেই। খোঁপাটা আলগা। পাশের ঘর থেকেই গন্ধ আসছে। শরৎবাবু বোধ হয় তাঁর ওষুধ খাচ্ছেন।

অল্প সময় চুপচাপ। অমৃতই কথা বলল, 'কাল সকালেই আমাদের বাস। সীতাকুণ্ড দেখতে যাব। বিকেলে না-ও ফিরতে পারি। একবার রাজগীর যাবার ইচ্ছে আছে। এসেছি যখন এদিকে, একবার হয়ে যাওয়াই ভাল। পরশু ফিরতে পারব না। ফিরে এসেই আবার কলকাতা।'

'ও! এ ক'দিন তোমরা তাহলে থাকছই না?'

'না,' মাথা নাড়ল অমৃত। 'ফিরে এসেই আবার কলকাতা।'

'কলকাতায় কোথায় থাক?'

'শ্যামবাজারের দিকে', অমৃত বলল; গলির নামও।

'তোমার চাকরি কি সরকারী অফিসে?'

'না; ব্যাংক।'

গায়ের চাদর আলগা করে দিলেন পূর্ণশশী। হাঁটুর দিকে কাপড় গোছালেন।

অমৃত অন্যমনস্ক ভাবেই যেন পূর্ণশশীর চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমার বাবাকে হয়তো আপনি চেনেন।

পূর্ণশশী ঠিক বুঝলেন না যেন, সামান্য আগ্রহও বোধ করলেন না, নিস্পৃহ চোখে তাকালেন।

অমৃত স্পষ্ট করে, ঝোঁক দিয়ে নিয়ে বলল, 'সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার; সুরেন মজুমদার।'

পূর্ণশশীর যেন কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল নামটা মনে আনতে। চোখের পাতা কুঁচকে ছোট হয়ে এল। 'সুরেন মজুমদার! কোন্ সুরেন মজুমদার?'

'গান লিখতেন থিয়েটারে। দু-তিনটে নাটকও ছিল…।'

পূর্ণশশীর চোখের পাতা কাঁপল না। অবাক হয়েছেন। খানিকটা যেন অবিশ্বাসও রয়েছে। অমৃতকে লক্ষ করতে করতে শেষে কৌতূহলের গলায় বললেন, 'তুমি সুরেনবাবুর ছেলে?' বলে সামান্য ঝুঁকে পড়লেন, 'কই, আগে তো বল নি?'

অমৃত পরম আগ্রহে পূর্ণশশীকে দেখছিল। এমন করে দেখছিল, যেন পূর্ণশশীর এই পুরোনো, ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ চেহারার হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে যাবে। কিছু একটা চমকে দেবে পূর্ণশশীকে, কিংবা বিহ্বল করবে। এই পূর্ণশশীর ভেতর থেকে অন্য কোন পূর্ণশশী উঠে আসবে।

তেমন কিছুই ঘটছিল না। বাবা মারা যাবার অনেক পরেও অমৃত কখনো কখনো বাবার কোন একটা পুরানো জিনিস হাতে পেয়ে গেছে; বাবার কোন শৌখিন শাল, বাবার ব্যবহার করা সোনার জল ধরানো চশমা, এমন কি মার বাক্সে সযত্নে রেখে দেওয়া বিয়ের জোড়-টোড়। জিনিসগুলো যখনই তার হাতে এসেছে, সে নিবিষ্ট হয়ে সেগুলো দেখেছে। তখন অমৃতর কেমন মনে হত, ওর মধ্যে বাবা আছে; বাবা যেন কোন যাতুবলে ওর মধ্য দিয়েই হঠাৎ উঠে আসবে, সেই পুরোনো বাবার চেহারা নিয়ে। কিছুই অবশ্য কোনদিন ঘটে নি; অমৃতই শুধু নিজের মনে মনে পিছিয়ে গিয়েছে যতটা পেরেছে।

পূর্ণশশী যেন কিছু বললেন।

অমৃত তাকাল। তখনও ঘোর রয়েছে যেন।

'সুরেনবাবু মারা যাবার পর'—পূর্ণশশী বললেন, 'ওঁর সম্পর্কে কোন খবরই পাই নি। শুনেছিলাম তাঁর বসত বাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছিল।'

'মর্টগেজ ছিল। থিয়েটারে টাকা দিতেন। ধার-দেনা ছিল অনেক। সবই চলে গেল।'

পূর্ণশশী আক্ষেপের মৃত্যু শব্দ করলেন। ঈষৎ মমতা যেন চোখে। 'অথচ উনি কী ভাল লোকই ছিলেন। এমন মানুষ বড় দেখাই যেত না। দরাজ মন। টাকা পয়সা কত যে ছড়াতেন…'

'নিজের সবই', অমৃত বলল হঠাৎ, 'টাকা পয়সা শুধু নয়।'

পূর্ণশশীর চোখের মণি স্থির হল মুহূর্তের জন্যে। পরে চঞ্চল হয়ে পাশের দিকে সরে গেল। 'হ্যাঁ, থিয়েটার ভালবাসতেন খুব।'

পাশের ঘর থেকে সমানে গন্ধ আসছে। শরৎবাবু তাঁর ওষুধ খাচ্ছেন। এ-ঘরের সমস্ত কিছু বন্ধ থাকায় গন্ধটা যেন বাতাসে জমে যাচ্ছে।

'সুরেনবাবুর বাড়ির কোন খবরই আর রাখতে পারি নি,' পূর্ণশশী বললেন, 'তা তোমার মা কেমন আছেন?'

'মা নেই। মারা গেছেন।'

'সে কি! কতদিন হল?'

'তা কম হল না; বছর পাঁচ।'

পূর্ণশশী নীরব। আলোর দিকে তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বাইরের দরজার দিকে চেয়ে থাকলেন। দরজা ভেজানো রয়েছে। দেওয়ালের অন্ধকার থেকে টিকটিকি ডেকে উঠল।

পূর্ণশশীই কথা বললেন, 'সুরেনবাবুর কথা মনে পড়লে দুঃখ হয়। কত সুন্দর সুন্দর গান লিখেছিলেন তখন। নিজেই সুর করিয়ে দিতেন। তাঁর চর্চা ছিল। গুণী মানুষ তো বটেই।'

অমৃত বলল, 'আজ সে সব গানের একটাও নেই। যা আছে অন্যের নামে চলে।'

'আজকালকার কথা বাদ দাও, বাবা! কে কার খোঁজ রাখে।'

'বাবার দু-চারটে নাটকও ছিল। তাও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'আমি জানি। সুরেনবাবুর দুটো নাটকে আমি হিরোইন ছিলাম। তিনি নিজে আমায় একটা পুরোনো টপ্পা শিখিয়েছিলেন। নিধুবাবুর বোধ হয়।'

অমৃত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশের ঘর থেকে ভাঙা, জড়ানো, অধৈর্য গলায় শরৎবাবু ডাকলেন, 'শশী—শশী—'

পূর্ণশশী মাঝের ঘরের দরজার দিকে তাকালেন। 'বসো আসছি।'

অমৃত বসে থাকল। ঘর ফাঁকা। মেটে আলোয় ঘরের প্রায় সবটাই অস্পষ্ট। ছাদের গা থেকে অন্ধকার ঝুলছে, দেওয়ালের ওপর কালচে ছায়া গাঢ় হয়ে বসে আছে, টিকটিকি ডাকছে কখনো কখনো, শরৎবাবুর ঘর থেকে মদের গন্ধ আসছে সমানে।

বসে থাকতে থাকতে অমৃতর মনে হল, এই ঘরটাই যেন স্টেজের একটা দৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সেকেলে দৃশ্য। নায়িকা বুঝি পূর্ণশশী। অথচ আজ আর বাবার শেখানো কোন গান, কিংবা অন্য কিছু গাইতে গাইতে এসে পড়বেন না।

ভাল লাগছিল না অমৃতর। উঠে পড়ল।

পূর্ণশশী ঘরে এলেন। 'উঠছ?'

'যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

বইটা হাতে করেই উঠে দাঁড়িয়েছিল অমৃত। খেয়াল হল। 'এটা নিন।'

পূর্ণশশী হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন। 'কি বই? সুরেনবাবুর?'

অমৃত পূর্ণশশীর মুখের দিকে তাকাল। 'মৃতের সহিত কথোপকথন।'

বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন পূর্ণশশী। অমৃত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

'তোমরা কলকাতায় যাবার আগে ফিরছ তো এখানে?'

'ফেরার কথা। তবে সেবতী যদি রাজগীর থেকেই ফিরে যেতে চায় সেই রকম ব্যবস্থা করেই যাব। তাহলে আর ফেরা হবে না।'

অমৃত আর পিছন ফিরে তাকাল না।

পূর্ণশশী বই হাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বাতাস দিচ্ছিল উত্তরের। রাত হয়ে যাওয়ায় ঠাণ্ডা পড়ছিল।